হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. মতি মিয়া দ্রুত পায়ে হাঁটছিল

ফেরার গল্প ভাটি অঞ্চল নিয়ে।

আমার নানার বাড়ির দেশ, যেখানে শৈশবের বর্ণাঢ্য দিনগুলি কাটিয়েছি। গল্পের মূল চরিত্রের কেউ আর বেঁচে নেই। তাদের কথা আজ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করছি।

গল্পে বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছি। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে অপ্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের একটি নির্ঘন্ট বইয়ের শেষে জুড়ে দিয়েছি। ভাটি অঞ্চলের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে সাহায্য করেছেন আমার মা এবং আমার হোটমামা মাহবুবুন্নবী শেখ। তথ্যগত ভুল কিছু থাকলে তার দায়দায়িত্ব তাঁদের।

ফেরা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ঈদ সংখ্যা উত্তরাধিকারে (১৯৮৩)।

০১.

মতি মিয়া দ্রুত পায়ে হাঁটছিল।

আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সঙ্গে ছাতাফাতা কিছুই নেই, বৃষ্টি নামলে ভিজে ন্যান্যাতা হতে হবে।

মতি মিয়া হনহন করে ডিসট্রিক্ট বোর্ডর সড়ক ছেড়ে সোহাগীর পথ ধরল। আর তখনি বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মতি মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা দরকার। শরিফার পা ফুলে ঢোল হয়েছে। কাল সারা রাত কোঁ-কোঁ করে কাউকে ঘুমাতে দেয় নি। সন্ধ্যার পর আমিন ডাক্তারের এসে দেখে যাবার কথা। এসে হয়তো বসে আছে। মতি মিয়া গম্ভীর একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। ঢালা বর্ষণ, জামগাছের ঘন পাতাতেও আর বৃষ্টি আটকাচ্ছে না, দমকা বাতাসের শো-শোঁ আওয়াজ। দিনের যা গতিক, ঝড়-তুফান শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার কোন অর্থ হয় না। মতি মিয়া উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তায় নেমে পড়ল। পা চালিয়ে হাঁটা যায় না। বাতাস উল্টো দিকে উড়িয়ে নিতে চায়। নতুন পানি পেয়ে পথ হয়েছে দারুণ পিছল। ক্ষণে ক্ষণে পা হড়কাচ্ছে। সরকারবাড়ির কাছাকাছি আসতেই খুব কাছে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। আর আশ্চর্য, বৃষ্টি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মতি মিয়া অবাক হয়ে শুনল সরকার বাড়িতে গান হচ্ছে। কানা নিবারণের গলা বাতাসের শো-শোঁ শব্দের মধ্যেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে,

আগে চলে দাসী বান্দি পিছে ছকিনা,
তাহার মুখটি না দেখিলে প্রাণে বাঁচতাম না
ও মনা ও মনা .....

সরকারবাড়ির বাংলাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। মতি মিয়া ধাক্কা দিতেই নাজিম সরকার মহা বিরক্ত হয়ে দরজা খুললেন। হ্যাঁ, কানা নিবারণই গাইছে। সেই গাট্টাগোট্টা চেহারা,

পান-খাওয়া হলুদ রঙের বড়ো বড়ো কুৎসিত দাঁত। কানা নিবারণ গান থামিয়ে হাসিমুখে বলল, মতি ভাই না? পেন্নাম হই। অনেক দিন পরে দেখলাম।

মতি মিয়া বড়োই অবাক হল। কানা নিবারণের মতো লোক তার নাম মনে রেখেছে। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। কানা নিবারণ গম্ভীর হয়ে বলল, মতি ভাইরে একটা গামছা-টামছা দেন।

কেউ গা করল না। নাজিম সরকার রাগী গলায় বললেন, ভিজা কাপড়ে ভিতরে আসলা যে মতি? দেখ ঘরের অবস্থা কী করছ। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর হইল না, ছিঃ ছিঃ।

কানা নিবারণ বলল, ঘরে না আইসা উপায় কি? বাইরে ঝড়-তুফান।

নাজিম বড়োই গম্ভীর হয়ে পড়লেন। থেমে থেমে বললেন, তুমি গান বন্ধ। করলা কেন নিবারণ?

কানা নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু করল–

দুধের বরণ সাদা সাদা কালা দিঘির জল
তাহার মনের গুপ্ত কথা আমারে তুই বল।

মনটা উদাস হয়ে গেল মতি মিয়ার। শরিফা বা আমিন ডাক্তার কারোর কথাই মনে রইল না। কন্যার মনের গুপ্ত কথাটির জন্যে তারো মন কাঁদতে লাগল। আহা, এত সুন্দর গান কানা নিবারণ কী করে গায়? কী গলা।

গান থামল অনেক রাতে। ততক্ষণে মেঘ কেটে আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। গাছের ভেজা পাতায় চকচক করছে জোঙ্গা। মতি মিয়া উঠোনে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে। বিড়ি টানতে টানতে নিবারণ বাইরে আসতেই মতি মিয়া বলল, কেমন চাঁদনি রাইত, দেখছেন নি নিবারণ ভাই?

চাঁদনি রাইত নিবারণকে তেমন অভিভূত করতে পারল না, বিড়িতে টান দিয়ে সে প্রচুর কাশতে লাগল। কাশির বেগ কমে আসতেই গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িত যান মতি তাই, রাইত মেলা হইছে।

আর গাওনা হত না?

নাহ, আইজ শেষ। ওখন বেশি গাই না। বুকের মধ্যে দরদ হয়।

ডাক্তার দেখান নিবারণ ভাই।

নিবারণ বিরক্ত মুখে এক দল থুথু ফেলে, চোখ কুঁচকে বলল, বাড়িত যান। আমার ডাক্তার লাগে না।

রাস্তায় নেমেই মতি মিয়া লক্ষ করল–আবার মেঘ করেছে। দক্ষিণ দিকে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চৌধুরীবাড়ির কাছাকাছি আসতেই দুই পহরের শেয়াল ডাকল। এতটা রাত হয়েছে নাকি? চারদিক নিশুতি। চাঁদ মেঘের আড়ালে পড়ায় ঘুঘটে অন্ধকার, গা ছমছম করে।

কেডা, মতি নাকি?

মতি মিয়া চমকে দেখে, হোট চৌধুরী। উঠোনে জলচৌকি পেতে খালিগায়ে বসে আছেন। এঁর মাথা পুরোপুরি খারাপ। গত বৎসর কৈবর্তপাড়ার একটা ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।

কে, একটা কথা কয় না যে? মতি নাকি?

জ্বি।

এত রাইতে কই যাও?

বাড়িত যাই।

তোমার বড় পুলাড়া তোমারে খুজতেছে। তোমার বৌয়ের অবস্থা বেশি বালা না। নীলগঞ্জে নেওন লাগব।

জি আচ্ছা।

জ্বি জ্বি কর কেন মতি মিয়া? তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।

মতি মিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট চৌধুরীর অভ্যাস হচ্ছে ভালোমানুষের মতো কথা বলে হঠাৎ তাড়া করা। সে কারণেই চট করে সামনে থেকে চলে যেতে ভরসা হয় না।

ছোট চৌধুরী গর্জন করে ওঠেন, কথা কানে ঢুকে না? থাপ্পড় দিব, ছোটলোক কোথাকার। যা, বাড়িত যা।

মতি মিয়া বাড়ি ফিরে দেখে আমিন ডাক্তার বসে আছে। শরিফার জ্ঞান নেই। আজরফ চুলা ধরিয়ে কি যেন জ্বাল দিচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বলল, অবস্থা বড় সঙ্গিন। রাইত কাটে কিনা সন্দেহ।

মতি মিয়া কিছু বলল না। যেন সে আমিন ডাক্তারকে দেখতেই পায় নি। আজরফের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ধমক দেয়, অত রাইতে কী জ্বাল দেস?

চা। আমিন চাচা চায়ের পাতা আছে।

আমিন ডাক্তার মৃদু স্বরে বলল, সারা রাইত জাগন লাগব, চা ছাড়া জুইত হইত না। বুঝছনি মতি, নীলগঞ্জ নেওন লাগব।

আমিন ডাক্তার লোকটি ভীতু প্রকৃতির। রুগীর অবস্থা একটুখানি খারাপ দেখলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নীলগঞ্জ নেবার জন্যে, বারবার বলে, রাইত কাটা সম্ভব না। রাইতের মধ্যেই ভালো-মন্দ হইতে পারে।

কিন্তু আজ রুগীর অবস্থা সত্যি খারাপ। আমিন ডাক্তার চিন্তিত মুখে ক্রমাগত হুঁকা টানে। মতি মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, মেয়েমানুষের মত বেআকেল জিনিস খোদার আলমে নাই, বুঝলা ডাক্তার?

ডাক্তার ইকা টানা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বলে, নীলগঞ্জ নেওনের ব্যবস্থা কর মতি।

কইলেই তো ব্যবস্থা হয় না। যোগাড়-যন্ত্র লাগে। সকাল হউক। টেকাপয়সার যোগাড় দেখি।

আইজ রাইতেই নেওন লাগব মতি।

মতি মিয়া কথা না বলে খেতে বসে। আজরফ ভাত বেড়ে দেয়। তাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে। কাঁচা মরিচে ঝালের বংশ নেই। মতি মিয়া আধপেটে খেয়েই হাত ধোয়। হোট ছেলে নুরুদ্দিন আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁষে বসেছিল। সে দীর্ঘ সময় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে বলে ফেলে, আমারে নীলগঞ্জ নেওন আগব বাজান।

বহু কষ্টে রাগ সামলায় মতি মিয়া। আমিন ডাক্তার বলে, চা খাও। আজরফ, রে বাপরে চা দে।

আমারে দিস না।

আরে খাও। বালা চা। মোহনগঞ্জের খরিদ।

নীলগঞ্জ যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র করতে অনেক সময় লাগে। বাঁশের যে-খুঁটিতে পয়সা জমান হত, সেটি কাটা হয়। সব মিলিয়ে সাত টাকার মতো পাওয়া যায় সেখানে। এতটা মতি মিয়া আশা করে নি। আজরফ চলে যায় নৌকার ব্যবস্থা করতে। ঠিক হয় আজরফ নুরুদ্দিন দুজনেই সঙ্গে যাবে। আমিন ডাক্তারও যাচ্ছে। নীলগঞ্জ হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার সাহেবের সঙ্গে তার নাকি ভালো জানাশোনা। আপনি আপনি করে কথা বলে।

খালি বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে আনা হয়েছে রহিমাকে। রহিমার মেয়েটি কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। শরিফার জ্ঞান ফিরেছে। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলে, ঠিক বোঝা যায় না। মতি মিয়া কড়া ধমক লাগায়, চুপ। একদম চুপ। বেআক্কল মেয়েমানুষ।

শরিফা চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার এক ফাঁকে বলে, আমারে যে সাথে। নিছ সেই বাবদ দুই টেকা ভিজিট কথা স্মরণ রাখবা মতি।

মতি মিয়া দারুণ বিরক্ত হয়।

তোমারে সাথে নেওনের কথা তোকই নাই। নিজের ইচ্ছায় তুমি যাইতাছ।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়।

নৌকায় উঠবার মুখে ঋপঋপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। দুইয়ের নিচে খড় বিছিয়ে শরিফার বিছানা। শরিফার গায়ের সঙ্গে সেঁটে লেগে থাকে নুরুদ্দিন। ডাক্তার বসেছে নৌকার সামনের মাথায়। এর মধ্যেই সে ভিজে চুপসে গেছে। তার সঙ্গে ছাতা আছে। কিন্তু রুগী নিয়ে কোথায়ও যাওয়ার সময় ছাতা মেলতে হয় না। খুব অলক্ষণ। নৌকাতে দুটি মুরগি এবং একটি পাকা কাঁঠাল নেওয়া হয়েছে। নীলগঞ্জ বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

মুরগি দুটি অনবরত ডানা ঝাপ্টায়। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে হঁক ধরায়। বৃষ্টির ছাট থেকে ককে আড়াল করে রাখতে তাকে অনেক কায়দা-কানুন করতে হয়। পাকা কাঁঠালের গন্ধের সঙ্গে

তামাকের গন্ধ মিশে অদ্ভূত একটা মিশ্র গন্ধ তৈরী হয়। তুমুল বর্ষণের মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আজরফ টপাটপ বৈঠা মারে। মতি মিয়ার বড়ো মায়া লাগে।

শীত লাগে আজরফ?

নাহ্।

মাথাডা গামছা দিয়া বাঁধ। মাথা শুকনা থাকলে সব ঠিকঠাক–বুঝছস?

বুঝছি।

বৈশাখ মাসের বিষ্টির মজাটা কি জানস নি আজরফ?

না।

মজাটা হইল, অসুখ-বিসুখ হয় না। সব আল্লাহর কেরামতি।

আজরফ কথা বলে না। ছৈয়ের ভেতর থেকে শরিফা বিড়বিড় করে কী যেন বলে। অসহ্য বোধ হয় মতি মিয়ার।

কি কও?

পুলাড়া ভিজতাছে।

দুত্তেরি মেয়েমানুষ। বিষ্টির সময় ভিজত না?

অসুখ করব।

চুপ থাক মাগী, খালি প্যানপ্যাননি।

আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়ে জাতের সাথে এই সব গালিগালাজ করা ঠিক না মতি।

তুমি ফরফর কইর না, চুপ থাক।

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। ছপছপ বৈঠা পড়ে। মৈয়ের ভেতর থেকে মুরগি দুটির ডানা ঝাপটানর আওয়াজ আসে। দূরের সোপোতার হাওরের দিক থেকে হত হত শব্দ হয়। গা ছমছম করে আজরফের। নৌকা এখন বড়ড়া গাঙে পড়বে। জায়গাটা খারাপ। গাঙের মুখটাতেই তিনটি প্রকাণ্ড শ্যাওড়া গাছ। রাতে নাম নেওয়া যায় না, এমন সব বিদেহী জিনিসদের খুব আনাগোনা।

নৌকা নীলগঞ্জে পৌঁছল দুপুরের পর। মতি মিয়ার নড়বার শক্তি নেই। একনাগাড়ে নৌকা বেয়ে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার চিন্তা ছাড়া তার মাথায় এখন আর কিছু ঢুকছে না। আমিন ডাক্তার একাই গেল হাসপাতালে খোঁজ নিতে। ঘন্টাখানিক পর ফিরে এল মুখ কালো করে। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব গেছেন ছুটিতে। কখন আসবেন কেউ জানেনা। কম্পাউণ্ডার সাহেবের মেয়ের বিয়ে। তিনি গেছেন বাঁশখালি।

বিষ্যত্বর নাগাদ আসবার কথা। মতি মিয়ার কোনো ভাবান্তর হল না। সে গম্ভীর মুখে বলল, চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করি নাই, কী কও ডাক্তার? কপালের লিখন না যায় খণ্ডন করণের তো কিছু নাই।

আমিন ডাক্তার চুপ করে থাকল। মতি মিয়া বলল, খাওয়া-খাইদ্য শেষ কইরা চল বাড়িত যাই।

মতি ভাই, চল মিশনারি হাসপাতালে লইয়া যাই। বেশি দূর না, একটা মুটে হাওর পরে সোনাদিয়া হাওর।

আমিন ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মতি মিয়া ঝাঁঝিয়ে ওঠে, এই সব খিরিস্তানির মধ্যে আমি নাই। এই সব কথা মুখে আইন্য না, বুঝলা?

আমিন ডাক্তার চুপ করে যায়। শরিফারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। জারুল গাছের ছায়ায় নৌকা বেঁধে ভরপেট চিড়া খেয়ে মতি মিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে সন্ধ্যার পর। নৌকা তখন সোনাদিয়ার হাওরে পড়েছে। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। পাল খাটান হয়েছে। আমিন ডাক্তার হাল ধরে বসে আছে। ভাবখানা এরকম, যেন কিছুই জানে না।

মতি ভাই, বাতাসের এই ধরনের জোর থাকলে এক পহরেই মিশনারি হাসপাতালে পৌঁছান যাইবে।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে।

তামুক খাইবা নাকি, কি ও মতি ভাই?

নাহ্।

মিশনারি হাসপাতালে এক বার নিয়া ফেলতে পারলে বুঝলা আর চিন্তা নাই। হেইখানে নিখল সাব ডাক্তার খুব এলেমদার লোক।

মতি মিয়া চুপ করে থাকে। আড়চোখে দেখে, আজরফ কাল রাতের পরিশ্রমে কাহিত হয়ে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। শরিফার মুখের কাছে ভনভন করে মাছি উড়ছে একটা। মরে গেছে নাকি? মরলেই কি আর বেঁচে থাকলেই কি? হাওরের দিগন্তবিস্তৃত কালো পানির দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায় তার। জগৎসংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সে চাপা স্বরে গুনগুন করে–,

লোকে আমায় মন্দ বলে রে
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে
আমি কোথায় যাব কি করিব
দুঃখের কথা কাহারে করে।
মন্দ বলে মন্দ বলে মন্দ বলে রে।

আমিন ডাক্তার মৃদু স্বরে বলে, তুমি কিন্তু বড়ো ছাতক, মতি ভাই।

২. গয়নার নৌকায়

মতি মিয়া পাঁচ দিন পর গয়নার নৌকায় ফিরে এল। সঙ্গে নুরুদ্দিন। নিখল সাব ডাক্তার (রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন) বলেছেন সারতে সময় নেবে। অবস্থা ভালো নয়, কাটাকুটি করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাসখানেক লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমিন ডাক্তারের নাকি তেমন কাজকর্ম নেই। সে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে, সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে আসবে। মতি মিয়া অবাক হয়ে বলেছে, এক মাস যদি থাকন লাগে, তুমি খাইবা কী?

হইব একটা ব্যবস্থা। রুগী ফালাইয়া তো যাওন যায় না।

ব্যবস্থা যে কী হবে, মতি মিয়ার মাথায় আসে না। আমিন ডাক্তারের কাছে। আছে সর্বমোট সাড়ে ন টাকা। কিন্তু আমিন ডাক্তারকে মোটই বিচলিত মনে হয় না। আজরফকে অবশ্যি নিখল সাব বাসায় কাজ দিয়েছেন। নদী থেকে সে গোসলের পানি তুলে আনে, বিকালে হাসপাতালের মেঝে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। যত ঘষাঘষিই করা হোক, সাহেবের পছন্দ হয় না। মাথা নেড়ে বলেন, আরো ভালো করো। জোরে ব্রাশ করে।

খাওয়াদাওয়া সাহেবের এখানেই হয়। সে খাওয়াও রাজ-রাজড়ার খাওয়া। সকালবেলা পাউরুটি, চিনি, একটা কলা আর এক কাপ দুধ। সন্ধ্যাবেলা বই-খাতা নিয়ে বসতে হয়। কালো মোটামত এক জন মহিলা অনেককে বর্ণ-পরিচয় শেখান। একটি ব্লকবোর্ড প্রকাণ্ড একটা অ লিখে সুরেলা স্বরে বলেন, বল অ। সবাই সমস্বরে বলে, অ। বল আ . ... .আ।

আজরফের খুব মজা লাগে। পড়া শেষ হবার পর হয় প্রার্থনা। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত করুণ সুরে টেনে টেনে বলেন,

হে পরম করুণাময় ইশর,
তুমি তোমার মঙ্গলময় করুণার হস্ত প্রসারিত কর।
....

প্রার্থনার জায়গায় এলেই আজরফের ভয়ভয় করে। কে জানে এরা হয়তো খিরিচান করে ফেলছে। আমিন ডাক্তার অবশ্যি বলেছে, ভয়ের কিছু নেই। খিরিনী প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে মনে মনে কলেমা তৈয়ব পড়লেই সব দোষ কেটে যাবে। আমিন ডাক্তারের মতো জ্ঞানী লোককে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আজরফের আর ভয়টয় করে না। ভয় করে মতি মিয়ার। কোন কারণ ছাড়াই ভয় করে। নৌকা ছেড়ে নড়তে চায় না। আমিন ডাক্তারের ঠেলাঠেলিতে শরিফাকে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড। হাসপাতালের বারান্দায় মুখ ভর্তি করে বমি করে। আমিন ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বলে, হইল কি তোমার মতি ভাই?

বদ গন্ধ মাথার মধ্যে পাক দেয়।

তোমারে নিয়া মুশকিল। ঐটা তো ফিাইলের গন্ধ।

কিসের গন্ধ?

ফিনাইল। এক কিসিমের সাবান। খুব ভালো জিনিস।

ভালো জিনিস মাথায় থাকুক। মতি মিয়া বাড়ি ফিরে বাঁচে, নুরুদ্দিন বাপের সঙ্গে ফিরে যেতে কোনো আপত্তি করে না। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি মন কান্দে নি নুরু?

নাহ্।

দুই দিন পরেই দেখবি আইয়া পড়ছে।

আইচ্ছা।

খুব বেশি হইলে এক হস্তা। এর বেশি না।

আইচ্ছা।

যাত্রা দেখতে চাস? মোহনগঞ্জে যাত্রা আইছে। বিবেকের পাঠ করে আসলাম মিয়া। ছয়টা সোনার মেডেল। দেখবি?

নাহ্।

না বললেও মতি মিয়া এক রাত মোহনগঞ্জে থেকে যায়। এত কাছে এসে আসলাম মিয়ার বিবেকের গান না শোনা পাশের সামিল। নিতি দিন তো আর এমন সুযোেগ হয় না। মোহনগঞ্জ বাজারে দেখা হয়ে যায় কানা নিবারণের সাথে। সেও খুব সম্ভব আসলামের গান শুনতে এসেছে। সে একটা বড়ো কাপড়ের দোকানের সামনে বসে ছিল। তার মুখ দিয়ে ভকভক করে দেশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ও নুরা, দেখছ? হই দেখ কানা নিবারণ।

কোন জন?

কালামতো মোটা। লম্বা বাবড়ি।

চউখ তো দুইটাই আছে, ইনারে কানা নিবারণ ডাকে ক্যান?

ছেলের কথায় মতি মিয়া বড়ই খুশি হয়। ছেলে চুপচাপ থাকলে কী হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিকই আছে। মতি মিয়া হাসিমুখে বলে, মাইনষের খিয়াল! মাইনষের খিয়ালের কি ঠিক-ঠিকানা আছে?

ছেলেকে দাঁড় করিয়ে মতি মিয়া চলে যায় কানা নিবারণের সামনে। দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক না।

নিবারণ ভাই, শইলডা বালা?

কানা নিবারণ কথা বলে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।

চিনছেন আমারে? আমি মতি। সোহাগীর মতি মিয়া।

কানা নিবারণ ঘঘালাটে চোখে তাকায়, উত্তর দেয় না।

আসলাম মিয়ার গাওনা হনতে আইছেন নি নিবারণ ভাই? কানা নিবারণ সে কথারও জবাব দেয় না।

বাড়ি ফিরেও নুরুদ্দিন কোনো রকম ঝামেলা করে না। নিজের মনেই থাকে। মতি মিয়া বারবার জিজ্ঞেস করে, মার লাগি পেট পুড়ে?

নাহ।

মুখ শুকনা ক্যান? নিচ্ছ পেট পুড়ে?

নাহ।

মতি মিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে। কিছুতেই মন বসে না। নইম মাঝির বাড়ি সন্ধ্যার পর গান-বাজনার আয়োজন হয়। মতি মিয়া রোজ যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। সেখানেও শুধুই যাই-যাই করে।

সন্ধ্যা কালে বাড়িত গিয়া করবাটা কী মতি ভাই?

পুলা একলা আছে।

হে তো ঘুমইতাছে। বও দেহি, হুক্কাডাত একটা টান দিয়া হারমুনিডা ধর।

বাড়ি ফিরে তার ভালো লাগে না। কেমন উদাস লাগে। রাতের খাওয়া শেষ হলে এক-আধ দিন রহিমার সাথে খানিক গল্পগুজব করে। রহিমা লম্বা ঘোমটা টেনে বারান্দায় বসে। কথা বলার সময় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখে। মতি মিয়া তার গ্রাম সম্পর্কে ভাসুর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। রহিমার সঙ্গে কথা বলতে মতি মিয়ার খারাপ লাগে না।

নিখল সাব কেমন ডাক্ত মতি ভাই?

জব্বর ডাক্তর।

পরিষ্কার বাংলা কথা কয়?

তা কয়। গেরাইম্যা কথাও কইতে পারে?

না। বুঝতে পারে।

দুনিয়াডাত কত কিসিমের জিনিসই না আছে মতি ভাই।

কথা ঠিক। খুব খাড়ি কথা।

নিখল সাব ডাক্তরে দেখনের বড় শখ লাগে মতি ভাই।

তা এক দিন যামুনে নিয়া। দুই দিনের মামলা।

দেখতে দেখতে মাস পার হয়ে যায়, ঘোর বর্ষা নামে। শরিফাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহের কথা বলে চৌধুরীদের একটা নৌকা নেওয়া হয়েছিল। চৌধুরীবাড়ির কামলা এসে রোজ হম্বিতম্বি করে।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি। কাজকর্ম নেই। সোহাগীতে বোরা ধান ছাড়া কিছুই হয় না। ভাটি অঞ্চলগুলিতে তাই অগ্রহায়ণ না আসা পর্যন্ত অলস মন্থর দিন কাটে। মতি মিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করে। শরিফাদের ফিরতে এতটা দেরি হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। বড়োই মন খারাপ লাগে তার। পাড়াপড়শিও খোঁজখবর করে।

বাচ্চা বিয়াইতে বাপের বাড়িতে গেলেও তো এক মাসের মধ্যে ফিরে, কিন্তু ইদিকে যে মাসের উপর হইল। খোঁজখবর কর মতি। গাছের মত থাইক না।

নইম মাঝি এক দিন ঠাট্টার ছলে অন্য রকম একটা ইঙ্গিত করে, মতি ভাই, আমি চিন্তা করছি আমিন ডাক্তারের সাথে নটখট কইরা দেশান্তরী হইল কিনা। পালের নৌকা তো সাথেই আছে, হা হা হা।

গা রিরি করে মতি মিয়ার। নেহায়েত বন্ধুমানুষ বলে চুপ করে থাকে। নইম মাঝি বলে, রাগ করলা নাকি, ও মতি ভাই। ঠাট্টা-মজাক বুঝ না তুমি?

না, রাগ-ফাগ করি নাই।

আর বিবেচনা কইরা দেখ, আমিন ডাক্তরের সাথে ভাবীবের খাতির-প্রণয় একটু বেশিই ছিল। হা হা হা।

হাইস না নইম, এইসব হাসি-মজাকের কথা না।

এই তো রাগ হইল। ভাবীর লগে রঙ-তামশা না করলে কার লগে মু? হাসিঠাট্টা বুঝতে পারার মত বুদ্ধিশুদ্ধি মতি মিয়ার আছে। কিন্তু শরিফা এবং আমিন ডাক্তারকে নিয়ে এই জাতীয় ঠাট্টা সে সহ্য করতে পারে না। কারণ, ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়। আমিন ডাক্তার কাজে-অকাজে তার বাড়ি এস গলা উচিয়ে ডাকবে, দোস্তাইন, ও দোস্তাইন। চায়ের পাতা নিয়া আসলাম। জর পাতা। একটু চা খাওন দরকার। ঘরে গুড় আছে?

মতি মিয়ার অসংখ্য বার ইচ্ছা হয়েছে আমিন ডাক্তারকে ডেকে বলে দেয়, যাতে সময়ে-অসময়ে এইভাবে না আসে। কিন্তু কোনো দিন বলা হয় নি। এটা অত্যন্ত ঘোট কথা। আমিন ডাক্তারের মতো বন্ধুমানুষকে এমন একটা ছোট কথা বলা যায় না।

শরিফাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মতি মিয়া অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। গান-বাজনা এখন ভালো লাগে না। নিখল সাব ডাক্তারের হাসপাতালে চলে গেলে হয়। মেলা খরচান্ত ব্যাপার। আবার একটু লজ্জালজ্জাও করে। নুরুদ্দিনকে আড়ালে এক বার জিজ্ঞেস করে, ও নুরা–মারে আনতে যাইবি?

নাহ।

না কি ব্যাটা! মার লাগি পেট পুড়ে না?

নাহ।

কস কী হারামজাদা! মায়া-মুত কিছুই দেহি তর মইধ্যে নাই।

নুরুদ্দিন মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখে মনেই হয় না, মায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতি তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেছে।

নুরুদ্দিন রহিমার মেয়ে অনুফার সাথে গম্ভীর মুখে সারা দিন খেলাধূলা করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই দেখা যায় নুরুদ্দিন গাঙের পাড়ের একটি জলপাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে অনুফা। দুই জনেই নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে। মতি মিয়া বেশ কয়েক বার লক্ষ করেছে ব্যাপারটি। এক দিন নুরুদ্দিনকে ডেকে ধমকেও দিল, গাছের মধ্যে বইয়া থাক, বিষয় কী?

নুরুদিন নিরুত্তর।

দুপুরবেলা সময় খারাপ। জ্বীন-ভূতের সময়, হেই সময় গাছে বইয়া থাকনের দরকার কী?

নুরুদ্দিন চোখ পিটপিট করে। কথা বলে না।

খবরদার, আর যাইস না।

আইচ্ছা।

তবু নুরুদ্দিন যায়জলপাই গাছের নিচু ডালটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আপন মনে কথা বলে। গাছের গুড়িতে বসে থাকে অনুফা। ক্ষণে ক্ষণে ফিক্‌ফিক্‌ করে সে। মতি মিয়া ঠিক করে ফেলে নুরুদ্দিনের জন্যে একটা তাবিজটাবিজের ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষণ ভালো নয়। রহিমার সঙ্গেও এই বিষয়ে সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। মতি মিয়া আড়াল থেকে শুনেছে, রহিমার সঙ্গে সে হড়বড় করে অনবরত কথা বলে। রাতের বেলা কাঁথা-বালিশ নিয়ে রহিমার সঙ্গে ঘুমাতে যায়। এতটা বাড়াবাড়ি মতি মিয়ার ভালো লাগে না।

রহিমা মেয়েটি অবশ্য খুবই কাজের। এই কয় দিনেই সে বাড়ির চেহারা পাল্টে ফেলেছে। পুবের ঘরের সামনে আগাছার যে-জঙ্গল ছিল তার চিহ্নও নেই। চার-পাঁচটা কাগজি লেবুর কলম লাগিয়েছে সারি করে। বাড়ির পেছনের রান্নার জায়গাটা দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। ঘাটে যাওয়ার পথটায় সুন্দর করে ইট বসান। ইটগুলি যোগাড় হয়েছে কোত্থেকে কে জানে? মতি মিয়ার ইচ্ছা করে রহিমাকে এই বাড়িতেই রেখে দিতে। শরিফার ঘরের লাগোয়া একটা ছোটমধ্যে চালাঘর তুলে দিলেই হয়। শরিফা কিন্তু রাজি হবে না। কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় করবে। কারণ রহিমার বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী। একটি সুন্দরী এবং অল্পবয়েসী। মেয়েকে জেনেশুনে কোনো বাড়ির বৌ নিজের বাড়িতে রাখবে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে উপস্থিত। তাকে আর চেনার উপায় নেই। গায়ে বড় একটা কটকটে লাল রঙের কোট। কোটটির স্কুল নেমে এসছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। চোখে সোনালি রঙের একটি নিকেলের চশমা। কোটটি নিখল সাব আসবার সময় দিয়েছেন। চশমাটি হাসপাতালে খুজে পাওয়া। চশমায় সব জিনিস কেমন যেন ঘঘালাটে

দেখায়। কোটের সঙ্গে চশমা না থাকলে মানায় না বলেই গ্রামে ঢোকবার মুখে আমিন ডাক্তার চোখে চশমা দিয়ে নিয়েছে।

মতি মিয়া নইম মাঝির ঘরে তাস খেলছিল। খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। এত রাতেও আশেপাশেরদু-এক ঘরের মেয়েছেলেরা এসে জড়ো হয়েছে। নুরুদ্দিনকাঁচা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে আছে।

শরিফা ঘরের ভেতরে চৌকির উপর বসে ছিল। মতি মিয়াকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন কোনো কারণে লজ্জা পাচ্ছে। মতি মিয়া অবাক হয়ে দেখল, শরিফার গোল মুখটা কেমন যেন লম্বাটে লাগছে। চুল অন্যভাবে বাঁধার জন্যই হোক, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক–শরিফাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মতি মিয়া গভীর হয়ে বলল, শরীলডা বালা?

শরিফা জবাব দিল না।

কি, শরীলডা বালা?

শরিফা থেমে থেমে বলল, পাওড়া কাইট্টা বাদ দিছে।

মতি মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। সত্যি সত্যি শরিফার একটা পা নেই।

শরিফা বলল, বাঁচনের আশা আছিল না। কপালে আরো দুঃখ আছে, হেই কারণে বাঁচলাম। তোমার শইলা কেন?

মতি মিয়া চুপ করে রইল। সে তখনো শরিফার একটি পা, যা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে, সে দিকে তাকিয়ে আছে। সেই পাটিতে আবার লাল টুকটুক একটা নতুন স্যাণ্ডেল। শরিফা থেমে থেমে বলল, রহিমা অখনো এই বাড়িত ক্যান? তারে বিদায় দেও নাই ক্যান? যুবতী মাইয়ামানুষ নিয়া এক ঘরে থাক, কাজটা ভালো কর নাই। রহিমারে কাইল সক্কালেই বিদায় দিবা, বুঝছ?

মতি মিয়া জবাব দিল না। শরীফা চিকন সুরে বলল, আর নুরার শইলডা কেমুন খারাপ হইছে। আমি ডাক দিছি, হে আসে নাই। দৌড় দিছে রহিমার দিকে। এই সব বালা লক্ষণ না। রহিমা তার কে?

৩. রহিমা তার পুঁটলি গুটিয়ে মেয়ের হাত ধরে

রহিমা তার পুঁটলি গুটিয়ে মেয়ের হাত ধরে চৌধুরীবাড়ি চলে গেল। তার নিজের বাড়ি-ঘর কিছু নেই। চৌধুরীদের দালানের শেষ মাথায় একটি অন্ধকার কুঠরিতে সে মাঝেমধ্যে এসে থাকে। চৌধুরীরা কিছু বলে না। যত দিন এখানে থাকে, তত দিন যন্ত্রের মতো এ বাড়ির কাজকর্ম করে। যেন এটিই তার বাড়ি-ঘর।

একনাগাড়ে অবশ্যি বেশি দিন থাকতে হয় না। গ্রামের কোনো পোয়াতি মেয়ের বাচ্চা হয়েছে, কাজকর্মের লোক নেই–মহিমাকে খবর দেয়। রহিমা তার ছোট্ট পুঁটলি আর মেয়ের হাত ধরে সে-বাড়িতে গিয়ে ওঠে। রান্নাবান্না করে। শামুক ভেঙে হাঁসকে খাওয়ায়। ছাগল হারিয়ে গেলে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজতে বের হয়। যেন নিতান্তই সে এই ঘরেরই কেউ। নতুন বাচ্চাটি এক দিন শক্তসমর্থ হয়ে ওঠে, রহিমাকে মেয়ের হাত ধরে আবার ফিরে আসতে হয় চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, এখন আর লাগে না।

দীর্ঘদিন পর আজ এই প্রথম রহিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মতি মিয়ার ঘর-বাড়ি কোনট-এক বিচিত্র কারণে তার কাছে আপন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এখানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে চমৎকার হত। তার কপালটা এরকম কেন?

নতুন বৌ হয়ে যখন আসে, অনুফার বাবা তখন কামলা মানুষ। বৌ তোলার জায়গা নেই। মানুষটা নতুন বৌকে চৌধুরীদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেছে ঘর-দুয়ারের ব্যবস্থা করতে। চৌধুরী সাহেব মহা বিরক্ত, নতুন বৌয়ের সামনেই ধমকাচ্ছেন, অগ্রায়ণ

মাসে এমন কাম-কাজের সময় কেউ কি বিয়াসাদি করে? তোর মতো আহাম্মক খোদার আলমে নাই রে মনু।

লেকটা দাঁত বের করে হাসে। চৌধুরী সাহেব প্রচণ্ড ধমক দেন। হারামজাদা হাসিস না। আমার পুবের একটা ঘর খালি আছে, বৌরে সেইখানে নিয়া তোল।

চৌধুরী সাব, নিজের একটা ঘরে নিয়া তুলনের ইচ্ছা। বাঁশটাশ যদি দেন তো একটা ঘর বানাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, ঘর তুলবি, জায়গা-জমি কই? ঘর তুলবি কিসের উপর?

আমার বসতবাড়ির লাগি একটুখানি জায়গাও যদি দেন, ধীরে ধীরে দাম শোধ করবাম।

বলতে বলতে লোকটা হাসে। যেন খুব একটা মজার কথা বলছে। চৌধুরী সাহেব অবশ্যি তাকে জায়গা দেন। মসজিদের কাছের এক টুকরো পতিত জমি। লোকটা ঘরামির কাজে খুব ওস্তাদ ছিল। দেখতে দেখতে বাঁশ কেটে চমৎকার একটা ঘর তুলে ফেলল। নতুন-কাটা কাঁচা বাঁশের গন্ধে রহিমার রাতে ঘুম আসে না। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। লোকটির অবশ্যি ফুর্তির সীমা নেই। দুপুর রাতে কুপি জ্বালিয়ে বাঁশের কঞ্চি কাটছে। ঘরের চার দিকে বেড়া দেবে। বিশ্রাম এক জিনিস সে জানত না।

কিন্তু সেই বৎসর খুব কাজে ফাঁকি দিল। চৌধুরীদের তখন জালা বোনা হচ্ছে। দম ফেলার সময় নেই। কাজে বিরাম দিয়ে এক দণ্ড যে কা টেনে শরীর গরম করবে, সে অবসরটাও

নেই। এর মধ্যেই দেখা গেল মনু উধাও। অন্য মনিব হলে কী হত বলা যায় না, চৌধুরী সাহেব বলেই দেখেও দেখেন না। পুরুষ মানুষ দিনেদুপুরে বাড়ি এসে বৌয়ের সঙ্গে গল্প, কী লজ্জার কথা রহিমা শরমে মরে যায়। কিন্তু লোকটার লাজলজ্জার বালাই নেই। এক রাত্রে রহিমাকে জোর করে নৌকায় তুলে বড়ো গাঙ পর্যন্ত চলে গেল। চাঁদনি রাতে নৌকা বাওয়ার মধ্যে খুব নাকি আনন্দ। আনন্দ ছিল ঠিকই। নদীর জলে ভেঙে-পড়া জ্যোঙ্গা, দূরের বিল থেকে ভেসে আসা হত হত শব্দ, দুই পাশে গাছগাছালির গায়ে মাখা অদ্ভুত এক জ্যোভেজা অন্ধকার। কী যে ভালো লেগেছিল রহিমার। এর মধ্যে ঐ লোক আবার ভাঙা গলায় গান ধরল। সুর তাল কিছুই নেই, তবু সেই গান শুনে বারবার চোখ ভিজে উঠল রহিমার।

মানুষটি বড়ো সৌখিনদার ছিল। দু টাকা দিয়ে এক বার এক গায়ে-মাখা সাবান কিনে আনো। কী বোটকা গন্ধ! গা বমি-বমি করে। আরেক বার কিনল হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রবারের জুতো। এই প্যাক-কাদার দেশে কেউ জুতো কেনে? সরকারবাড়ির নেজাম সরকার পর্যন্ত খালি পায়ে মাঠে যান ক্ষেত দেখতে। জুতো কেনার পর থেকে মচমচ শব্দে লোকটা শুধু হাঁটে। চৌধুরী সাহেব এক দিন ডেকে বললেন, টেকা পয়সা জমাইবার অভ্যাসটা কর মন। নিজের একটা বাড়ি-ঘর। বিয়া-সাদি করছস, দায়দায়িত্ব আছে। খামাখা এই জুতা কিলি ক্যান?

জুতাডা চদরী সাব হস্তায় পাইছি। খুব কামের। পানির মইধ্যে হারা দিন থাকলেও এক ফোডা পানি ঢুকত না।

এই সব ধান্ধা বাদ দে মনু।

লোকটার স্বভাব তবু বদলায় না। ভাদ্র মাসে ছাতা কিনে ফেলল একটা। বাহারী ছাতা। বাঁটের মধ্যে হরিণের মুখ। বড়ই রাগ হয় রহিমার। কিন্তু কার উপর রাগ করবে? এই লোক কি রাগ-টাগ কিছু বোঝে? চৌধুরী সাহেব খুব বিরক্ত হন।

বৃষ্টি-বাদলা কিছু নাই। শুকনা দিন। মাথার মইধ্যে ছাতি কেন রে মনু?

নয়া কিনছি চদরী সাব। পাইকারি দরে দিছে।

তোর কপালে দুঃখু আছে মনু।

হা হা করে হাসে মনু। যেন ভারি একটা মজার কথা শুনল।

সেই লোক কোথায় যে হারিয়ে গেল।

গয়নার নৌকায় মোহনগঞ্জ গিয়েছে, পর দিন ফেরার কথা। আর ফেরে নি। দেখতে দেখতে মাস শেষ হল। কোনো খোঁজই নেই। কী কষ্ট, কী কষ্ট। অনুফা তখন পেটে। রাতের পর রাত জেগে বসে থাকে রহিমা। খুট শব্দ হলেই লাফ দিয়ে ওঠে, এল বুঝি। কত রকম উড়ো খবর আসে। এক বার শুনল, বাজারের একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকে। সেই মেয়েমানুষটা চোখে সুরমা দেয়, ঘাগরা পরে। আবার এক বার শুনল, আসাম গেছে। আসামে কাঠের ব্যবসা করে।

হয়তো তাই এক দিন টাকাপয়সা নিয়ে গভীর রাতে রবারের জুতোয় মসমস শব্দ করে লোকটা উপস্থিত হবে। রহিমা যত রাগই করুক, লোটা গলা ফাটিয়ে হাসবে হা হা হা।

বৈশাখ মাসে অনুফার জন্ম হল। চৌধুরী সাহেব বললেন বাচ্চা নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। রহিমা রাজি নয়। হঠাৎ যদি কোন দিন লোকটা এসে উপস্থিত হয়, তখন?

গাঁয়ের সবাই সাহায্য করেছে। চাল-ডাল তরিতরকারি–অভাব কিছুরই হয় নি। চৌধুরী সাহেব মেয়ের মুখ দেখে ২০টি টাকা দিলেন। আমিন ডাক্তারের মতো হতদরিদ্র লোকও পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল।

অনুফা একটু বড় হতেই অন্য রকম ঝামেলা শুরু হল। গভীর রাত্রে ঘরের পাশে কে যেন হাঁটাহাঁটি করে, খুটখুট করে দরজায় শব্দ। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে রহিমা।

কে গো, কেডা?

আর কোনো সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত যেতে হল সুরুজ মিয়ার বাড়ি। চৌধুরী সাহেবের ওখানে যেতে সাহসে কুলোয় না। হোট চৌধুরী পাগল মানুষ। কোনো কোনো সময় দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে রাখতে হয়।

সুরুজ মিয়ার স্ত্রটি চিরগণা। তার দু বছরের ছেলেটিও সেরকম। রাত-দিন ট্যা-ট্যা করে কাঁদে। রহিমার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসূত রইল না। ধান কাটার সময় তখন। সুরুজ মিয়া অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। তিন-চার জন উজানদেশী জিরাতি কামলা তার। সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত খাটাখাটনি করতে হয় রহিমাকে। খারাপ লাগে না। কিন্তু এক গভীর রাত্রে

সুরুজ মিয়া এসে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। স্তম্ভিত রহিমা কিছু বুঝবার আগেই সুরুজ মিয়া তার মুখ চেপে ধরল, শব্দ কইর না, মাইয়া জাগব।

মেয়ে অবশ্যি জাগল না। এক সময় অন্ধকার ঘরে বিড়ি ধরাল সুরুজ মিয়া। ফিসফিস করে বলল, পাপ যা হওনের, হে তো আমার হইল–তুমি কাল ক্যান? শরীরের মইধ্যে কোনো দোষ লাগে না। বুঝছ?

রহিমা চলে এল চৌধুরীবাড়ির অন্ধকার কোঠায়। ঘোট চৌধুরী লাল চোখে ঘুরে বেড়ায়। রহিমার আর ভয় লাগে না। অনুফাকে মাঝে মাঝে তাড়াও করে। অনুফা খেলা মনে করে খিলখিল করে হাসো হোট ছৌধুরী চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, হাসিস না হারামজাদী বিন্দু। খবরদার, হাসিস না।

এক সময় সেই লোকটির চেহারাও রহিমার মনে রইল না। মাঝে মাঝে খুব যখন ঝড়-বৃষ্টি হয়, বিলের দিক থেকে শী-শী শব্দ ওঠে–তখন ভাবতে ভালো লাগে লোকটা রবারের জুতো পায়ে দিয়ে মচমচ করে যেন এসেছে। অসম্ভব তো কিছুই নয়। হারিয়ে যাওয়া মানুষ তো কতই ফিরে আসে।

কিংবা কে জানে সেই লোকটি হয়তো কোন এক ভিন দেশে গিয়ে আমিন ডাক্তারের মতো মহাসুখে আছে। আমিন ডাক্তার যেমন এক দিন গয়নার নৌকায় করে সোহাগীতে উপস্থিত হল, তারপর আর যাওয়ার নাম করল না। কে জানে সেও উজান দেশে তার বৌ-মেয়ে

ফেলে এসেছে কিনা। হয়তো তারাও অপেক্ষা করে আছে কবে ফিরবে আমিন ডাক্তার। রহিমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে।

৪. শরিফার কিছুই ভালো লাগে না

শরিফার কিছুই ভালো লাগে না।

এটি যেন তার নিজের বাড়ি নয়। যেন সে বেড়াতে এসেছে। পাড়া-প্রতিবেশী বৌ-ঝিরাও কেমন যেন সমীহ করে কথা বলে। একটু দূরত্ব রেখে বসে। নানান কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, কাটা পাওড়া কই ফালাইয়া আসছ?

শরিফার অসহ্য বোধ হয়। সরু গলায় বলে, হাসপাতালেই রাইখ্যা আইলাম। সাথে আইন কী করবাম?

নইমের বৌ ভীত স্বরে বলে, পাওডারে কবর দিছে?

শরিফার কাঁদতে ইচ্ছা করে। এক পা নিয়ে কাজকর্ম সে কিছুই করতে পারে না। সারা সকাল লেগে যায় ভাত ফোটাতে। থালাবাসন থোবার জন্যে আজরফকে কলসি দিয়ে পানি এনে দিতে হয়। হাসপাতালে থাকার সময় এই সব ঝামেলার কথা তার মনে হয় নি।

আমিন ডাক্তার সব দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে বলল, রহিমারে খবর দিয়া আনা দরকার দোস্তাইন।

না।

কিছু দিন সে থাকুক।

কইলাম তো না।

সুবিধার লাগি না কইতাছি।

আমার সুবিধা দেখনের দরকার নাই।

শরিফা কাঁদতে শুরু করল। তার একটি নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। প্রায়ই যে কোনো প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে শেষ পর্যায়ে কাঁদতে শুরু করবে।

দোস্তাইন, কান্দনের কারণ তো কিছু নাই।

যার আছে হে বুঝে।

ইদানীং শরিফার মনে ধারণা হয়েছে, মতি মিয়া তাকে এখন আর দেখতে পারে না। গত রাত্রে মতি মিয়া বারান্দায় বসে ছিল। শরিফা তিন বার গিয়ে ডাকল। তিন বারই সে বিরক্ত হয়ে বলল, ঘুমাইবার সময় হউক, সন্ধ্যা রাইতেই ডাক ক্যান? আমি তো নয়া সাদি করি নাই, সন্ধ্যা রাইতেই ঘরে খিল দেওনের যোগাড় করবাম।

কী কথার কী জবাব। শুধু মতি মিয়া নয়। আজরফ পর্যন্ত তার কথার জবাব দেয় না। এক কথা দশ বার জিজ্ঞেস করতে হয়।

এক দিন দেখা গেল আজরফ বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘরের লাগোয়া নতুন একটা চালাঘর তুলছে। নুরুদ্দিন মহা উৎসাহে এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। মতি মিয়া ইকা হাতে দাওয়ায়

বসে তদারক করছে। ঘরে নতুন কাজকর্ম হলে আজকাল আর কেউ শরিফাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। শরিফা মুখ কালো করে বলল, আজরফ ঘর তুলতাছস ক্যান?

আজরফ জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায় নি।

আজরফ, নয়া ঘর তুলনের দরকারডা কী?

জবাব দিল মতি মিয়া, পুলাপান বড় হইতাছে, একটা ঘর তো দরকার। শরিফা লক্ষ করল, নুরুদ্দিন মুখ টিপে হাসছে।

বিষয়টা কী, নুরা?

নুরুদ্দিন দাঁত বের করে হাসল। ঘর উঠছে রহিমা খালার লাগি। রহিমা খালা আর অনুফা থাকব।

শরিফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। মতি মিয়া থেমে থেমে বলল, তোমার সুবিধা হইব খুব। ঘরের কাজকাম দেখব।

আমি বাইচ্চা থাকতে এই বাড়িত কেউ আসত না।

মতি মিয়া বলল, আইজ সন্ধ্যায় আইব, খামাখা চিল্লাইও না।

আমি গত দড়ি দিয়াম কইতাছি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে ডাকল, আজরফ।

জ্বি।

তোর মারে বালা দেইখ্যা একটা দড়ি দে দেহি।

রহিমা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়ল।

সে তার যাবতীয় সম্পত্তিও সঙ্গে এনেছে। একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছয়-সাতটি হোট-বড়ো পুঁটলি, হাঁড়ি-ডেকচি। অনুফার হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছাগল। রহিমা শরিফার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, বুজির শইলডা বালা?

শরিফা কোন কথা বলল না। রাতে খাওয়ার সময় বলে পাঠাল তার খিদে নেই। অনেক রাত্রে ঝপঝপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। শরিফা শুনল, নতুন চালাঘরে খুব হাসাহাসি হচ্ছে। মতি মিয়া কী-একটা বলছে, সবাই হাসছে। সবচেয়ে উঁচু গলা হচ্ছে নুরুদ্দিনের।

অনেক রাত্রে মতি মিয়া যখন ঘুমোতে এল, শরিফা তখনো জেগে। কুপি নিভিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শরিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, একটা কথার সত্যি জবাব দিবা?

কী কথা?

তুমি কি রহিমারে বিয়া করতে চাও?

মতি মিয়া দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বলল, হ।

তুমি রহিমারে এই কথা কইছ?

না। আমিন ডাক্তার কইছে রহিমার মত নাই। তার ধারণা মনু বাইচ্চা আছে।

মতি মিয়া হুঁক ধরাল। শরিফা ধরাগলায় বলল, বিয়াটা কবে?

মত না থাকলে বিয়াটা হইব কেমনে?

আইজ মত নাই, এক দিন হইব।

মতি মিয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। অরক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে লাগল। শরিফা সারা রাত জেগে বসে রইল।

৫. গোটা জ্যৈষ্ঠমাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নি

গোটা জ্যৈষ্ঠমাসে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নি।

বৃষ্টি-বাদলা না হলে জ্বরজারি হয় না। রুগীপত্র নেই, আমিন ডাক্তার মহা বিপদে পড়ে গেল। হাত একেবারে খালি। চৌধুরীবাড়িতে ত্রিশ টাকা কর্জ হয়েছে। গত বিশ দিনে রুগী এসেছে মাত্র একটি। সুখানপুকুরের অছিমুদ্দিনের মেজ ছেলে। ভিজিটের টাকা দূরে থাক, ওষুধের দামটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অজিমুদ্দিন নিমতলির পীর সাহেবের নামে কিরা কেটেছে হাটবার দিন সকালবেলা এসে দিয়ে যাবে। নিমতলির পীর জ্যান্ত পীর। তার নাম নিয়ে টালবাহানা করা যায় না। কিন্তু অজিমুদ্দিন লোকটি মহা ধুরন্ধর। আজ নিয়ে তিন হাট গেল, তার দেখা নেই।

আমিন ডাক্তার শুকনো মুখে সারা হাট খুঁজে বেড়ায়। হাটের দিন চাষাভূষাের মত থাকা যায় না। দশ গ্রামের লোকজন আসে। নতুন মানুষদের সঙ্গে আলাপপরিচয় হয়। কাজেই হাটবারগুলিতে আমিন ডাক্তার একটু বিশেষ সাজসজ্জা করে। আজকে দেখা গেল আমিন ডাক্তারের গায়ে এই গরমেও একটি লাল কোট। হাতে ডাক্তারী ব্যাগটা কায়দা করে ধরা। ব্যাগটিতে ইংরেজি লেখা–

ডক্টর এ রহমান
প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার

আমিন ডাক্তারের চোখে নিকেলের চশমা। লোকজন ঠাহর হয় না। বারবার দেখতে হয়। অজিমুদ্দিনের মেছোহাটায় থাকার কথা। সেখানে পাওয়া গেল সিরাজুল ইসলামকে।

সিরাজুল ইসলাম নিমতলির ডাক্তার। সমগ্র ভাটি অঞ্চলে তার নামী ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি। লোকটি ছোটখাট, টেনে টেনে অত্যন্ত কায়দা করে কথা বলে। সিরাজুল ইসলাম আমিন ডাক্তারকে দেখামাত্র একগাল হেসে বলল, এই গরমের মধ্যে এমন কোট। সগিমি হয়ে মরবেন, বুঝলেন?

আমিন ডাক্তার হাটের দিনগুলিতে যথাসম্ভব শহুরে কথা বলতে চেষ্টা করে। চারদিকে লোকজন আছে। ডাক্তার শহুরে কথা বললে এরা খুব সমীহ করে।

শরীরটা খারাপ, জ্বরজ্বর ভাব। ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, এই জন্যেই গরম কাপড় পরলাম।

চশমা নতুন নিলেন নাকি?

হুঁ।

সিরাজুল ইসলাম খিলখিল করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কী আছে, আমিন ডাক্তার বুঝতে পারল না।

হাসেন কেন?

হাসি আসলে হাসব না? বলছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে কীভাবে? আরে এখনো ইনফ্লুয়েঞ্জাই চিনলেন না, ডাক্তারী করেন কীভাবে? হা হ্যাঁ। হ্যাঁ। যেমন দেশ তেমন ডাক্তার।

সিরাজুল ইসলামের হাসির শব্দে লোক জমে গেল। আমিন ডাক্তার চট করে সরে পড়ল। মেছোহাটায় অজিমুদ্দিকে পাওয়া গেল না, অথচ তার এখানেই থাকার কথা। কারণ ছাড়া এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করা যায় না। আমিন ডাক্তার এক প্রকাণ্ড রুই মাছ দাম করে ফেলল। গম্ভীর গলায় বলল, মাছ কত রে?

মাছ বিক্রি করছিল নিমতলির জলিল। সে দাম না বলে মাছ গেঁথে ফেলল।

আপনের সাথে দূর-দাম কি ডাক্তার সাব? যা হয় দিবেন।

আরে ইয়ে, এত বড় মাছ। দামটাম কি বল শুনি।

হুনাহুনির কিছু নাই। বড় গাঙ্গের মাছ-এর সুআদই আলাদা।

আমিন ডাক্তার পড়ে গেল মহা বিপদে। বহু কষ্ট্রে মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, মুসিবত হয়ে গেল দেখি। টাকা তো আনতে মনে নেই। কি যেন বলে, ভুলে বোধহয় বাড়িতে ফালাইয়া অসছি।

মুছিবত কিছু না ডাক্তার সাব, টেকা আপনে পরের হাটে দিয়েন।

আমিন ডাক্তার মাছ হাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। এক বার মনে হল অজিমুদ্দিনের মতো দেখতে কে যেন হুট করে তরকারিহাটার দিকে চলে গেল। এত প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে অছিমুদ্দিনকে খুঁজে বের করার আর উৎসাহ রইল না। মাছ কেনাটা অবশ্য পুরোপুরি বৃথা গেল না। সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দেখা হয়ে গেল।

মাছটা কিনলেন নাকি ডাক্তার সাব? তা কিনলাম।

হুঁ, রোজগারপাতি ভালেই মনে হয়?

আমিন ডাক্তার যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, পাই কিছু। না পাইলে কি আর ভাটি অঞ্চলে পইড়া থাকি?

সিরাজুল ইসলাম শুকনো মুখে চুপ করে যায়। আমিন ডাক্তার হৃষ্ট চিত্তে সারা হাটে দুটি চক্কর দেয়। হাতে যে একটা পয়সা নেই, চৌধুরীদের কাছে ত্রিশ টাকা কর্জ–সেই সব আর মনে থাকে না। মুখের উপর অতিরিক্ত একটা গাম্ভীর্য টেনে আনে। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর হয়ে বলে, কি, ভালো?

কেডা, ডাক্তার সাব না?

হুঁ। ছিলাম না অনেক দিন। নিখল সাব ডাক্তারের কাছে ছিলাম। নতুন চিকিৎসাপাতি শিখলাম। সাহেব খুব স্নেহ করতেন আমাকে। ডাক্তার ডাক্তারের মর্যাদা বুঝে তো। অশিক্ষিত মূর্খ তো নয়, কী বল?

গো-হাটার কাছে দেখা হল মতি মিয়ার সঙ্গে। মতি মিয়ার কেমন যেন দিশাহারা ভাব। এত বড়ো একটা মাছ আমিন ডাক্তারের হাতে, তা মতি মিয়ার চোখেই পড়ল না।

ডাক্তার, তোমার সাথে একটা জরুরী আলাপ আছে।

আমিন ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, তোমার কাছে সাড়ে পাঁচ টাকা পাই মতি। টাকার আমার বিশেষ দরকার।

তোমারে কখন থাইক্যা খুঁজছি। আছিলা কই?

বুঝলা মতি, অযুদের জন্যে তিন টাকা আর তোমার......

কথা শেষ হবার আগেই মতি মিয়া আমিন ডাক্তারকে টেনে এক পাশে নিয়ে আসে। গলার স্বর দ ধাপ নিচে নেমে যায়। বিষয়টি সত্যি জরুরী। রূপকুমারী যাত্রা-পার্টির অধিকারী খবর পাঠিয়েছে, মতি মিয়া যদি বিবেকের পাঠ করতে চায় তাহলে যেন অতি অবশ্যি মোহনগঞ্জ চলে আসে। আগের বিবেক চাকরি ছেড়ে চলে গেছে বলেই এই সুযোগ।

বুঝলা ডাক্তার, বিবেকের পাঠে মোট দশ খান গান।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, আমারে কী জন্যে দরকার, সেইটা তো মতি ভাই বুঝলাম না।

শরিফারে একটু বুঝাইয়া কইবা। তোমারে খুব মানে।

তুমি নিজেই কও।

আমি কই ক্যামনে? আমার সাথে তো কথাই কয় না।

আবার হইল কী?

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমাবে বিয়া করবাম, হেইটা শুনার পরে ঝামেলা।

আমিন ডাক্তার আকাশ থেকে পড়ল, রহিমারে সাদি করবা? এই কথা তো আগে কও নাই।

মজাক কইরা কইছি। হাসি-তামশার কথা।

তুমি লোকটা অদ্ভুত মতি ভাই।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, অদ্ভুতের কী দেখলা? অন্যায়টা কী কইছি? আমার বাড়িত সারা জীবনের লাগি থাকব। বৌ হইয়া থাকনটা বালা না?

আমিন ডাক্তার চুপ করে রইল। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, রহিমা রাজি আছে কিনা হেইডাও তুমি একটু জাইন্যা দিবা, বুঝছ?

কী-সব কথা যে তুমি কও, মতি ভাই!

মতি মিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, আইজ রাইতেই আইবা, ঠিক তো?

দেখি।

দেখাদেখির কিছুই নাই, আইবা আইজ।

আইচ্ছা।

মাছটা কিনলা নাকি ডাক্তার বিষয় কী?

বিষয় কিছুনা, মাছটা লইয়া যাও। দোস্তাইনরে কইও রাইতে তোমরার সাথে ভাত খাইয়াম।

অত বড়ো মাছ কিনা, তোমার হনছি টোপয়সা কিছুই নাই।

আমিন ডাক্তার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আগামী হাটবারে টাকার কী হবে কে জানে?

বাড়ি ফিরতে দেরি হল। মতি মিয়া জোর করে একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। এক আনা করে কাপ। সেই সঙ্গে দুই পয়সা করে একটা টো বিস্কুট।

দোকানের চায়ের সুদই আলাদা, কী কও ডাক্তার?

হুঁ।

আরেক কাপ খাইবা?

নাহ্।

আরে খাও। এই, আরো দুইটা দে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতি মিয়া অস্বাভাবিক নিচু স্বরে বলল, বাজারে তিনটা মাইয়া আইছে, দেখছ? হাটবার দেইখ্যা আইছে, রঙ্গ-তামাশা করছে।

আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে তাকাল।

মতি মিয়া বলল, বাজারে মেয়েমানুষ ছাড়া কি হাট জমে, কও দেহি? এর মইধ্যে একটার নাম ফুলন। কাঁচা হলদির লাহান গায়ের চামড়া। আর চুল কী!

তুমি অত কিছু জানলা ক্যামনে? আহু, দেখলাম। দূর থাইক্যা দেখলাম। তুমি কি ভাবছ, গেছিলাম? মালুদে এলাহী।

চা গলায় লেগে মতি মিয়া বিষম খেল।

মেয়ে তিনটি নৌকা নিয়ে এসেছে। সেজেগুজে নৌকার সামনে বসে আছে দু জন। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল, একটি মেয়ে সত্যি অপূর্ব। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবীপ্রতিমার মতো লাগছে। মতি মিয়া আমিন ডাক্তারের হাতে একটি মৃদু চাপ দিয়ে বলল, উখ ট্যারা হইয়া যায়, কী কও ডাক্তার? ফুলনের আরেকটা নাম হইল গিয়া তোমার পরীবানু।

তুমি জানলা ক্যামনে?

হুনছি। হুনা কথা।

উত্তর বলে নেমে মতি মিয়া গুনগুন করে গান ধরল,

ও কইন্যা সোনার কন্যা রে
ও কইন্যা রূপের কন্যা রে
....

মতি মিয়ার গলা ভালো, আমিন ডাক্তারের মনটা উদাস হয়ে গেল।

৬. কাল সারা রাত্তি শরিফার ঘুম হয় নি

কাল সারা রাত শরিফার ঘুম হয় নি।

ইদানীং প্রায়ই এরকম হচ্ছে। সারা রাত এ-পাশ ও-পাশ করে কাটে। পাশেই মতি মিয়া গাছের মতো ঘুমায়। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাল রাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গায়ে ধাক্কা দিয়ে মতি মিয়ার ঘুম ভাঙাল। মতি মিয়া ঘুম

জড়ান স্বরে বলল, কী হইছে?

বাংলাঘরে কী যেন শব্দ করে। মনে লয় চোর আইছে।

আছে কী আমার, চোর আইব? ঘুমাও।

দেইখ্যা আও না।

মতি মিয়া ঘুরে এল, কোথায়ও কিছু নেই, খা-খাঁ করছে চারদিক।

মতি মিয়া ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার তাকে শরিফা ডেকে তুলল, আমার পিছনবাড়িত যাওন লাগব।

যাওন লাগব–যাও।

একলা যাই ক্যামনে?

দুত্তোরি মাগী। ঘুমাইতে যাওনের আগে সব শেষ কইরা আইতে পারছ না?

থাউক, যাওন লাগত না।

মতি মিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শরিফা খুনখুন করে কাঁদতে শুরু করল। লোকটা এই রকম কেন? এমন ভাব করছে, যেন শরিফা একটা কাঠের পুতলী। ছেলেগুলিও দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। নুরুদ্দিন তো তাকে সহ্যই করতে পারে না। রাতদিন রহিমার পিছে পিছে ঘুরঘুর করে। এক দিন সে গোসা করেছে, ভাত খায় না। কত সাধাসাধি। মতি মিয়া বলল, আজরফ বলল, এমন কি আমিন ডাক্তার পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করল। খাবেই না, শেষটায় রহিমা গিয়ে বলল, বাপধন খাও, খালার পাতে চাইর খাও।

অমনি সুড়সুড় করে খেতে বসল। যেন কিছুই হয় নি।

এই সব কথা মনে এলে চোখে পানি আসে। শরিফা ফুঁপিয়ে উঠল।

এই, কাল ক্যান? কান্দি না। ফোসফোস করতাছ ক্যান?

শরিফা ধরাগলায় বলল, আমি বাপের বাড়িত গিয়া কয়েকটা দিন থাকতাম চাই।

বাপের বাড়িত আছে কেডা?

ভাই আছে।

ভাই?

গলা ফাটিয়ে মতি মিয়া হাসল, এই সব চিন্তা ছাড়া দেও। অত যে ঝামেলা গেছে, তোমার গুণের ভাই একটা খোঁজ নিছে? কও, নিছে খোঁজ?

শরিফা মিনমিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না।

চিল্লাচিল্লি বন্ধ কইরা কাজ-কাম কর।

আমি চিল্লাচিল্লি করি?

না, তুমি তো নয়া কইন্যা। মুখের মধ্যে একটা কথাও নাই।

শরিফা আজকাল অবশ্যি খুবই চেঁচামেচি করে। রহিমার সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া করে। এইডা কী রানছে, ও রহিমা ওয়াক থু। হলুদের গন্ধে মুখে দেওন যায় না। হলুদ সস্তা হইছে? বাপের বাড়ির হলুদ পাইছ? ঝাঁটা দিয়া পিটাইয়া এই সব আপদ দূর করা লাগে।

সামান্য জিনিস থেকে কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই রহিমার মেয়েটাকে সে মারধোরও করে। মেয়েটাও মার মত চুপচাপ। মার খেয়েও শব্দ করে না। এক-একা পুকুর পাড়ে বসে থাকে। শরিফার অসহ্য বোধ হয়। কাউকেই সহ্য করতে পারে না। আমিন ডাক্তারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে কাঁদতে শুরু করে। আমিন ডাক্তার বিব্রত হয়ে বলে, কান্দনের কী হইল, ও দোস্তাইন?

আমারে বিষ আইন্যা দিয়েন।

কী ধরনের কথা কনা না দোস্তাইন, বাজে চিন্তা বাদ দেওন দরকার।

ধানকাটা শুরু হবার আগে মতি মিয়া মোহগঞ্জে চলে যাবে। রূপকুমারী যাত্রা পার্টির অধিকারী লোক পাঠিয়েছে। শরিফা আকাশ থেকে পড়ল, অখন তুমি যাইবা ক্যামনে, ধান কাটব কে?

আজরফ কাটব।

কও কী তুমি। আজরফ দুধের পুলা।

চুপ কর, খালি চিল্লায়।

মতি মিয়া গম্ভীর মুখে কাপড় গোছায়। শরিফা নুরুদ্দিনকে পাঠায় আমিন ডাক্তারকে ধরে আনতে। আমিন ডাক্তার আসতে পারে না। দীর্ঘ দিন পর তাকে নেবার জন্যে সুখানপুকুর থেকে নৌকা এসেছে। রুগী মরণাপন্ন, এখনি রওনা হওয়া প্রয়োজন।

নুরুদ্দিন, তর বাপরে ধরা-বাইন্ধা রাখ, আমি আইতাছি রাইতে–বুঝছস?

বুঝছি।

লোকটার মাথা খারাপ, এই সময় কেউ যায়? নৌকা ছাড় গো তোমরা।

নৌকা ছেড়ে দেওয়ার সময় আমিন ডাক্তার আরেক বার গম্ভীর হয়ে বলে, দুই টেকা ভিজিট, অষুধ ভিন্ন। আর নৌকা দিয়া ফিরত দিয়া যাইবা। সুখানপুকুর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত পুইয়ে যায়। নৌকা থেকে নেমে মাইল পাঁচেক হাঁটতে হয়। অসম্ভব কাদা এই অঞ্চলে। বড়োই কষ্ট হয় হাঁটতে। কোথাও থেমে যে বিশ্রাম নেওয়া হবে, সে উপায় নেই। রুগীর বাবা ঝড়ের মতো ছুটছে, বারবার বলছে, পা চালাইয়া হাঁটেন ডাক্তার সাব।

বাড়ির সামনে মুখ লম্বা করে সিরাজুল ইসলাম বসে ছিল। আমিন ডাক্তারকে দেখে গম্ভীর মুখে বলল, আপনাকেও এনেছে দেখি। হুঁ, আর কাকে আনবে?

রুগীর বাবা পা দেওয়ার পানি আনতে গেছে, এই ফাঁকে সিরাজুল ইসলাম গলা নিচু করে বলল, ডাক্তার পিষে খাওয়ালেও কিছু হবে না। শেষ অবস্থা। আর এমন চামার, বুঝলেন। দু টাকা দেওয়ার কথা দিয়েছে এক টাকা। মাছের বাজার আর কি।

রুগী দেখে আমিন ডাক্তার স্তম্ভিত। নয়-দশ বৎসরের একটা ছেলে। সমস্ত শরীর লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। শরীরে কোনো ব্যাথা বোধ নেই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে বলছে, পেটের মইধ্যে পাক খায়।

আমিন ডাক্তার এক চামচ এলকালি মিকচার খাইয়ে শুকনো মুখে বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। নোগামতো একটা মেয়ে ছেলেটির হাত ধরে বসে ছিল, সে কাঁদতে শুরু করল। আমিন ডাক্তার বলল, নৌকার যোগাড় দেখেন, হাসপাতালে নেওন লাগব। দিরং করন যাইত না।

ডাক্তারদের জন্যে পান-তামাক দেওয়া হয়েছে বাহির-বাটিতে। সিরাজুল ইসলাম কিছুই স্পর্শ করবে না। সে এক ফাঁকে আমিন ডাক্তারকে বলল, হাসপাতালে নেওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এই রুগী ঘন্টা পাঁচেকের বেশি থাকবে না। টাকা-পয়সা যা দেয় নিয়ে সরে পড়েন। রুগী মরলে পয়সাও পাবেন না। আপনাকে কেউ দিয়েও আসবে না। ছোটলোকের দেশে কেউ ডাক্তারী করে?

আমিন ডাক্তার থেমে বলল, ওর হইছে কী?

কিছু বুঝতে পারছেন না?

না।

হুঁ। ওর কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে পানি এসেছে, হাসপাতালেও কিছু করতে পারবে না।

কিছুই করণের নাই?

না।

সিরাজুল ইসলাম উঠে পড়ল। বেরুবার আগে বলল, আমি নিজের নৌকা নিয়ে। এসেছি। যদি যেতে চান যেতে পারেন।

এই রকম রুগী ফালাইয়া যাই ক্যামনে? থাকেন তাহলে।

সমস্ত দিন কাটল এইভাবে। রাত্রে অবস্থা খুব খারাপ হল। আমিন ডাক্তার বিষণ্ণ মুখে ঘরের দাওয়ায় বসে রইল। বেশ কয়েক বার ছেলের বাবাকে বলল, হাসপাতালে নেওন খুব দরকার। দিরং হইতাছে।

কেউ রুগী নাড়াচাড়া করতে রাজি হল না। নিমতলির পীর সাহেবকে আনতে নাকি লোক গিয়েছে। তিনি এসে যা বলেন, তা-ই করা হবে। পীর সাহেব মাঝরাত্রে পৌঁছলেন। ছোটখাট হাসিখুশি এক জন মানুষ। রুগীকে হাসপাতালে নেওয়া ঠিক হবে কিনা জানতে চাইতেই বললেন, ডাক্তার সাব যদি নিতে কন, তা হইলে নেন লাগব। ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রুগী দেখে তাঁর মত বদলাল। শান্ত স্বরে বললেন, হাতে সময় বেশি নাই।

ভোরাত্রে ছেলেটি হঠাৎ সুস্থ মানুষের মত মাথা তুলে বলল, শীত লাগে বাজান।

চার-পাঁচটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আমিন ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, শীত কমছে?

ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, শীত লাগে। জর শীত লাগে। ও বাজান, শইলডার মইধ্যে খুব শীত।

ফজরের আজানের পরপর ছেলেটি মারা গেল। ছেলের মা খুব কাঁদছিল। কে যেন বলল, কাইলেন না। মতের সময় কান্দন হাদিসে মানা আছে।

নিমতলির পীর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, দুঃখের সময় না কাঁদলে কোন সময় কাঁদব? কান্দুক, খুব জুরে জুরে কান্দুক।

বাড়ির সামনে একটি কাঁঠালগাছের নিচে দুপুর পর্যন্ত বসে রইল আমিন ডাক্তার। পকেটে কিছুই নেই যে একটা কেরাইয়া নৌকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। এমন অবস্থায় কাউকে বাড়ি ফেরার কথাও বলা যায় না। পেটে অসম্ভব খিদে, মরা বাড়িতে চুলা ধরা হবে না, কাজেই খাওয়াদাওয়া হবে কিনা বলা মুশকিল। দুপুরের রোদ একটু পড়তেই আমিন ডাক্তার হেঁটে চলে গেল নিমতলি। নিমতলি পৌঁছাতে পৌঁছাতে এক পহর রাত হল। সেখান থেকে সোহাগী এল জলিলের নৌকায়। তখন মাঝরাত্রি, ঘরে খাবার কিছুই নেই। একটি টিনে চিড়া ছিল, সেটিও শূন্য। মতি মিয়ার বাড়িতে গেলে হত। কিন্তু এই দুপুররাত্রে যাওয়া ঠিক নয়। .

খিদের জন্য ঘুম হল না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম মশারিটি শতচ্ছিন্ন। ভভন করছে মশা। নতুন মশারি একটি না কিনলেই নয়। আমিন ডাক্তার শুয়ে শুয়ে কত কথাই না ভাবে। কত বিচিত্র কথা মনে আসে। সুখানপুকুরের এক রুগী মরবার আগে হঠাৎ খুব আবক হয়ে বলেছিল, ঠাণ্ডা হাত দিয়া আমারে কে ছুইছে। ও ডাক্তর, বড় শীত লাগে। বড় শীত লাগে। বড় শীত।

মরবার আগে সবারই শীত লাগে কিনা, আমিন ডাক্তারের খুব জানতে ইচ্ছা করে।

৭. মাছ মারার জায়গা

নুরুদ্দিন খুঁজে খুঁজে চমৎকার একটি মাছ মারার জায়গা বের করেছে। বাড়ি থেকে সোয়া মাইল দূরে জংলা ভিটার ভাঙা ঘাট। জায়গাটি বড়ো নির্জন। দু পাশ অন্ধকার করে আছে ঘন কাঁটাবন। ভাঙা ঘাটের ফাঁকেফুঁকে সাপের আড্ডা। সে জন্যেই বড়ো কেউ আসে না এ-দিকটায়। ঘাটের লাগোয়া প্রকাণ্ড একটা ডেফল গাছে পাকা ডেফল টুকটুক করে। নুরুদ্দিন ছিপ ফেলে ডেফল গাছে হেলান দিয়ে সারা দুপুর বসে থাকে।

তার সঙ্গে প্রায়ই আসে অনুফা। সে নুরুদ্দিনকে বিরক্ত করে না। লম্বা একটি নারিকেলের ডোগা হাতে নিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কীসব কথা বলে। নুরুদ্দিন মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এ্যাই চুপ। অত কথা কইলে মাছ আই?

অনুফা অল্প কিছু সময়ের জন্যে চুপ করে আবার গুনগুন শুরু করে।

এ্যাই, অনুফা পাগলী নাহি তুই?

অনুফা রাগ করে না। খিলখিল করে হাসে। নুরুদ্দিনের বড় মায়া লাগে।

মাছ মারার এই জায়গাটা নুরুদ্দিন খুব সাবধানে গোপন করে রাখে। ঘাস কাটার জন্যে খোন্দায় করে কৈবর্তপাড়ার মাঝিরা এই খাল দিয়ে বড়ো গাঙের দিকে যায়। শব্দ পেলেই ডেফল গাছের আড়ালে চট করে লুকিয়ে পড়ে নুরুদ্দিন। তবু কেউ কেউ দেখে ফেলে। তখন বড়ো ঝামেলা হয়।

এইডা কে? মতি ভাইয়ের পুলা না? এই, কী করস তুই?

মাছ মারি।

মাছ মারস? মাথা খারাপ নাহি তর? এইডা মাছ মারণের জায়গা? যা, বাড়িত যা।

মাছ মারার জন্যে জায়গাটা কিন্তু খারাপ নয়। আজকেও নুরুদ্দিন দু হাত লম্বা একটা বোয়াল মেরে ফেলল।

অনুফার বিস্ময়ের সীমা রইল না, ও বাসরে, এইডা তো জব্বর মাছ নুরু ভাই!

শক্ত কইরা মাতা ধর। পানিত যেন না পড়ে, সাবধান।

পাকা বর্ণেলের মতো মুখ করে নুরুদ্দিন দ্বিতীয় বার ছিপ ফেলতে যায়। কিন্তু বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, এখন আর মাছে খাবে না।

চল, বাড়িত যাই অনুফা।

না।

না কি? দিয়াম এক চড়। বিষ্টি পড়ছে দেখস না?

পড়ুক বলেই অনুফা মাছ হাতে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল। এই তার একটা খেলা। দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে, কোথাও এক দণ্ডের জন্যে থামবে না।

জংলা ভিটা থেকে বেরিয়ে নুরুদ্দিন দেখে খুব মেঘ করেছে। ডেফল গাছের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ বোঝা যায় নি। নুরুদ্দিন দৌড়াতে শুরু করল। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে। রানীমার পুকুরপাড়ে উঠে আসার আগেই সে ভিজে ন্যান্যা হয়ে গেল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে সিরাজ চাচার নতুন চালাঘর। লালচাচী ছোটাছুটি করে ধান তুলছে। শুকাতে দেওয়া ধানের বেশির ভাগই গেছে ভিজে। লালচাচী নুরুদ্দিনকে দেখেই চেচিয়ে বললেন, নুরু, হাত লাগা। তর চাচা আইজ খুব চেত।

ধান তোলা শেষ হতেই বৃষ্টি থেমে গেল। লালচাচী হাসিমুখে বললেন, কাটা কেমুন হইল নুরা?

বিষ্টি আবার আইব চাচী।

ধান তো বেবাক ভিজছে নুরা। করি কী এখন ক দেহি? একলা মানুষ আমি, অত ধান শুকাইতে পারি? তুই বিবেচনা কর দেহি?

নুরুদ্দিন বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল লালচাচীর ঘরে। লালচাচীকে সে বেশ পছন্দ করে। নুরুদ্দিনের ধারণা, লালচাচীর মতো সুন্দরী (এবং ভালে) মেয়ে সোহাগীতে আর একটিও নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, লালচাচী তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে–যেন সে এক জন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। ও নুরা, তোর চাচারে কইলাম আমার হোড ভাইটারে আইনা রাখতে– কাজকামে সাহায্য হইব। তোর চাচা কী কয় জানস?

কী কয়?

কয়, চোরের গুষ্টি আইনা লাভ নাই।

কথাডা ঠিক অয় নাই চাচী, অলেহ্য হইছে।

আমার দাদা চোর আছিল, এইডা অস্বীকার যাই ক্যামনে? কিন্তুক হেইডা কোন আমলের কথা! পুরান কথা তুইল্যা মনে কষ্ট দেওন কি ঠিক?

না, ঠিক না চাচী।

হেইদিন তরকারির লবণ এটু বেশি হইছে, তোর চাচা কয়–চোরের গুষ্টির রান্দাবাড়া শিখনের তো কথা না।

কথাডা অলেহ্য হইছে চাচী।

অত চোর-চোর করলে বিয়া করল ক্যান? আমি কি পায়ে ধইরা সাধছিলাম?

ঠিক কথা চাচী।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লালচাচী কিছুতেই ছাড়বে না। বাপের বাড়ির পুরনো সব গল্প আবার শুনতে হল। গুড় দিয়ে এক থালা মুড়ি খেতে হল।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দিনের মুখ শুকিয়ে গেল। আজরফ নাকি তাকে বেশ কয়েক বার খোঁজাখুঁজি করেছে। আজরফকে আজকাল সে খুব ভয় পায়। আজরফ তাকে কিছুই বলে না। তবু

কেন জানি ভয়ভয় লাগে। শরিফা বলল, বিষ্টি-বাদলা না। হইলে রাইতে ধান মাড়াই দিতে চায়। তরে খুঁজছিল, কী যেন কইতে চায়।

কী কইতে চায়?

জিগাই নাই। অত কথা আমি জিগাই না।

নুরুদ্দিনের মনে হল, শুধু সে একা নয়–তার মা নিজেও আজকাল আজরফকে সমীহ করে চলে।

বন্দের মইধ্যে গিয়া জিগাইতাম?
যা, জিগা গিয়া।

উত্তর বলে আজ খুব কাজের ঘটা। ফিরাইল সাব বলেছেন, দু-এক দিনের মধ্যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হবে। সেই শিলা ফেরাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাজেই সম্ভব হলে আজকের মধ্যেই যেন ধান তুলে ফেলা হয়। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মশা তাড়াবার জন্যে ভেজা খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া করা হয়েছে। ছোট ঘোট ছেলেমেয়েরা জ্বলন্ত খড়ের দড়ির কাছে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। খুব কাজের চাপ তাদের। ডাক পড়তেই হুঁকো নিয়ে ছুটে যেতে হচ্ছে। ধানকাটার পুরো দলটি বৃষ্টিতে ভিজে জবজব। উত্তর বলেও আধ হাতের মতো পানি। ঘনঘন হুকায় টান দিয়ে শরীর চাঙ্গা করে নিতে হয়। উজান দেশের বেশ কিছু কামলা এসছে ধান কাটতে। এদের হয়েছে অসুবিধা। দিন-রাত পানিতে থাকার

অভ্যাস না থাকায় হাত-পা হেজে গিয়েছে। তারা ক্ষণে ক্ষণে কাজ ফেলে শুকনায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আজরফকে খুজে বের করতে বেশ দেরি হল। উত্তর বন্দে আজ সবাই ধান কাটছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় লোকজন চেনা যাচ্ছে না। তার উপর আজরফ কার জমিতে কাজ করছে তাও ঠিক জানা নেই। তাদের নিজেদের জমির সবটাই পুব বন্দে।

নুরুদ্দিন গলা উচিয়ে ডাকল, ও ভাইসাব।

খুব কাছ থেকে উত্তর হল, এই দিকে আয় নুরা।

আমারে নি খুঁজছিলা?

আজরফ কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। লুঙ্গির গেজ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, বাজানের চিঠি। জলিল মাঝির সাথে পাঠাইছে। ডাক্তার চাচারে দিয়া পড়াইয়া আন।

আইচ্ছা।

আর হন, আইজ ধান মাড়াই হইব।

কোন সময়? রাইত।

গরু পাইবা কই?

কালাচান চাচারে কইয়া রাখছি। তুই আরেক বার গিয়া জিগা।

আইচ্ছা।

যা, বাড়িত যা।

ভাত খাই না?

আইজ সরকারবাড়িত খাইয়াম। হেরার ধান কাটতাছি।

একটা বোয়াল মাছ মারছি, দুই আত লম্বা।

আজরফ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জংলা বাড়ির ভিটাত আর যাইস না নুরা। জায়গাড়া খারাপ। দোষ আছে। হের উপরে আবার সাপের উপদ্রুপ।

নুরুদ্দিনের মুখে কথা ফোটে না। তার গোপন জায়গার কথা আজরফ কীভাবে জানল কে জানে।

বাড়িত যা নুরা।

উত্তর বন্দ থেকে একা-একা বাড়ি ফিরতে নুরুদ্দিনের বড়োই ভালো লাগে। এত বড়ো বন্দ এই অঞ্চলে আর নেই। দিন-রাত হাওয়ায় শো-শোঁ শব্দ তোলে। উত্তর পশ্চিমে তাকালে কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু মনে হয়, দূরের আকাশ নেমে এসেছে মাটিতে। পুব দিকে তাকালে নিমতলি গ্রামের সীমানার তালগাছ দুটি আবছা চোখে পড়ে। তালগাছ দুটিতে

দোষ আছে। গভীর রাত্রে মাছ মারতে এসে অনেকেই দেখেছে, একটা জাম্বুরার মতো বড়ো আগুনের গোলা গাছ দুটির মাথায়। এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে, আবার ক্ষণে ক্ষণে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমিন ডাক্তার বাড়ির পেছনে খোলা চুলায় রান্না চাপিয়েছে। রান্নার আয়োজন নগণ্য। ঝিঙ্গে তাজি আর খেসারির ডাল। ভেজা কাঠের জন্যে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে চুলা থেকে। নুরুদ্দিন গিয়ে দেখে, একটা কাঠের চোঙায় মুখ দিয়ে আমিন ডাক্তার প্রাণপণে ফু দিচ্ছে। তার নিজের চোখ-মুখ লাল। কি রে নুরা, কী চাস? ভাত খাইবি?

নাহ্।

না কিরে ব্যাটা? ঝিঙ্গা ভাজা করলাম। গাওয়া ঘি আছে, দিয়াম নে এক চামুচ।

আইজ না চাচাজী। বাজানের একটা চিডি আনছি, পইড়া দেন। মতি মিয়া নিজেও লেখাপড়া জানে না। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে—

আজরফ মিয়া দেয়াগো,

আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কৃপায় সুস্থ শরীরে শান্তিমতো আছ। পর সমাচার এই যে, আমরা দল লইয়া অতি শীঘ্র নেত্রকোণা যাইতেছি। বিবেকের গান খুব নাম কামাইয়াছে। স্বয়ং কানা নিবারণও বলিয়াছে–গলা খুব উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরাতন বিবেক ফিরিয়া আসিয়াছে। কাজকর্ম ঠিকমতো করিবা। নতুন ধান উঠিবামাত্র আমাকে নি

ঠিকানায় বিশটি টাকা অতি অবশ্য পাঠাইবা। কিঞ্চিৎ আর্থিক অসুবিধায় আছি। আজ এই পর্যন্ত। ইতি।

আমিন ডাক্তার চিঠি শেষ করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইল। চিঠিতে করে ফিরবে, কি, কোনো উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা শরিফার কোনো কথা নেই।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, তর মায়ের কথাও লেখছে কোণাদিয়া— তোমার মাতার কথাও সর্বদা স্মরণ হয়। তুমি তাহার যথাসাধ্য যত্ন করিবাস্। নুরা তোর মায়েরে কইছ। তার কথাও লেখা।

আইচ্ছা। আর চাচাজী, আইজ আমরার ধান মাড়াই। আপনের যাওন লাগব। ২০৮।

দেহি।

দেহাদিহি নাই, যাওন লাগব।

রুগীইগী না থাকলে যাইয়াম নে এক ঘুরান।

ধান মাড়াইয়ের ব্যাপারে নুরুদ্দিনের খুব উৎসাহ।

মাঝরাতের দিকে চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধান মাড়াই শুরু হবে। চলবে সারা রাত। এক জন পালা করে থাকবে গরুর পেছনে, অন্য সবাই দল বেঁধে উঠোনে বসে। গল্প শুনবে। গল্প বলার জন্যে কথক আছে। তাদের বড়ো দাম এই রাত্রে। পানতামাকের ডালা খোলা। শেষত্রে পিঠা-চিড়ার ব্যবস্থা।

নুরুদ্দিনের খুব ইচ্ছায় এবারও গত বারের মতো আলাউদ্দিনকে খবর দেওয়া হয়। পেশায় সে চোর, কিন্তু তার মত বড় কথক ভাটি অঞ্চলে আর নেই। সে যখন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে দু হাত নেড়ে কিচ্ছা শুরু করে, তখন নিঃশ্বাস ফেলতে পর্যন্ত মনে থাকে না।

শুনে শুনেন দশ জনাতে
শুনেন দিয়া মন।
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে স্মরণ

তারপর হেই লাল চাঁন বাদশা উজির সাবরে ডাইক্যা কইল–ও উজির, একটা কথার জবাব দেও দেহি।

বাড়ি ফিরে নুরুদ্দিনের খুব মন খারাপ হল। কথক আলাউদ্দিন নিমতলি গিয়েছে, সন্ধ্যায় ফেরবার কথা, এখনো ফেরে নি। যদি না ফেরে? তার চেয়ে বড় কথা, শরিফা রেগে গিয়ে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছে অনুফার দিকে। সেই খড়ম কপালে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। অনুফা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। রহিমা মুখ কালো করে ঘরের কাজকর্ম করছে। নুরুদ্দিন অনুফার খোঁজে বেরুল। সে কোথায় আছে তা জানা। ছোট গাঙের পাড়ে জলপাই গাছের কাছে এসে নুরুদ্দিন ডাকল, ও অনুফা।

অনুফা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

আয়, বাড়িত যাই।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না।

বড়ো অন্ধাইর, হাত ধর অনুফা।

অনুফা এসে হাত ধরল। নুরুদ্দিন বলল, আইজ ধান মাড়াই, জানস?

জানি।

আলাউদ্দিন আইত না।

অনুফা মৃদু স্বরে বলল, আইব।

কী কস তুই।

দেখবা তুমি, আইব।

তুই খুব পাগলী অনুফা।

অনুফা খিলখিল করে হাসল। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল আলাউদ্দিন তার দল নিয়ে এসে পড়েছে। চাঁদ এখনো ওঠে নি। অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দিনের রোগা লম্বা শরীর। সে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে হুক টানছে।

কিচ্ছা শুরু হল অনেক রাত্রে। গ্রামের অনেকেই এসেছে। আজরফ হচ্ছে ঘরের কর্তা, পান-তামাক এগিয়ে দিচ্ছে। বউ-ঝিরা ভেতরবাড়িতে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর জন্যে চেয়ার আনা হয়েছে।

আলাউদ্দিন কোমরে লাল গামছা পেঁচিয়ে কিচ্ছা শুরু করেছে। সেই পুরান লাল চাঁন বাদশার গল্প। কিন্তু এ গল্প কি আর সত্যি সত্যি পুরনো হয়?

(গীত)

শুনে শুনেন দশ জনাতে
শুনেন দিয়া মন।
লাল চাঁন বাদশার কথা হইয়াছে শরণ।
লাল চাঁন বাদশার মনে বড়ো দুঃখ ছিল,
বার বল্ল পার হইল পূত্র না জন্মিল।
লাল চাঁনের দুঃখ দেইখ্যা কান্দে গাছের পাতা

৮. উত্তর বন্দের সমস্ত ধান

উত্তর বন্দের সমস্ত ধান কাটা হওয়ার পরপরই ফিরাইল সাব চলে গেলেন। যাবার পর দিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হল। তা তো হবেই, মাঠ-বন্ধন নেই। শিল আটকাবার আসল লোকই নেই। কালাচান খবর নিয়ে এল–ফিরাইল সাবের জন্যে উত্তর বলে যে খড়ের ছাউনি করা হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। শিলাবৃষ্টিতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সোহাগীর লোকজন স্তম্ভিত।

ফিরাইলের সাবের উপরে রাগ রইছে, বুঝলা না বিষয়টা?

রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। ফিরাইল সাব এই বৎসর উত্তর বলে শিল পড়তে দেন নি। সমস্ত নিয়ে ফেলেছেন নিমতলির বন্দে। ফিরাইল সাব বিদায় নেওয়ার আগে গ্রামে এসে উঠলেন কিছুক্ষণের জন্যে। গ্রামের বউ-ঝিরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে ঢাকায়। দেখেই বোঝা যায় বড়ো সহজ লোক ইনি নন। তাঁর সাথে চালাকি চলবে না। শুকনো দড়ি-পাকান চেহারা। মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধে গিয়েছে। হাতে জীয়ল গাছের শিকড়ে তৈরী একটি বাঁকা লাঠি। ফিরাইল সাব যাবার আগে বারবার বলে গেলেন–নিমতলির তালগাছের নিচে তিনটা বড়ো শউল মাছ পুড়িয়ে ভোগ দিতে। তালগাছে যে বিদেহী প্রাণীটি বাস করে, তাকে তুষ্ট রাখা খুবই প্রয়োজন। বাজ পড়ে যদি তাল গাছ দুটির একটিও পুড়ে যায়, তাহলে সমূহ বিপদ। বিপদ যে কী, তা তিনি ভেঙে বললেন না। পোয়াতি মেয়েছেলেদের উপর কঠোর নির্দেশ, তারা যেন কোনক্রমেই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা–এই দুই চাঁদে উত্তর বন্দে না যায়।

এ বৎসর খুব ভালো ফলন হয়েছে সোহাগীতে। লগ্নির ধান দেওয়ার পরও ধান। রাখার জায়গা নেই। আবুল কালামের মতো হতদরিদ্র ভাগচাষীরও খোরাকি ছাড়াই পঁচিশমণ ধান হল। এমন অবস্থায় জমকালো বাঘাই সিন্নি হবে, তা বলাই বাহুল্য। ধন কাটা শেষ হবার পরই প্রথম পূর্ণিমায় বাঘাই সিনির দল বেরুল। এই সব সাধারণত ছেলেহোকরার ব্যাপার। কিন্তু আমিন ডাক্তারের সে-খেয়াল নেই। দলের পুরোভাগে সে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেচে-কুঁদে এক হুলস্থূল ব্যাপার। মূল গায়ক এক জন, অন্য সবাই ধুয়া ধরে :

(মূল গীত)
আইলাম গো
যাইলাম গো
বাধাই সিন্নি চাইলাম।
(ধুয়া) চাইলাম গো। চাইলাম গো।

এই পর্যায়ে হাত-পা ছুঁড়ে নাচ শুরু হয়। মেয়েরা মুখে আচল চাপা দিয়ে হাসতে-হাসতে বাঘাই সিন্নির জন্যে ধামাভর্তি চাল বের করে দেয়।

আমিন ডাক্তারকে দেখে বয়স্কদের অনেকেই দলে ভিড়ে গেল। সুবহান আলির মতো রাশভারি মাতবর ব্যক্তি পর্যন্ত বাঘাই সিনির গানের ধুয়ায় সামিল হল।

সিন্নির আয়োজন হয়েছে উত্তর বন্দে। চারদিকে ফকফকা জ্যোৎস্না, দূরে সোহাগী গ্রাম ছবির মতো দেখা যায়। খোলা প্রান্তরে হাওয়া এসে শো-শোঁ বোঁ-বোঁ শব্দ তোলে। বাঘাই সিন্নি দিলের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। এক দিকে সিন্নি রান্না হয়, অন্য দিকে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে বাঘাই সিনির গান হয়। বড়ো গাঙ দিয়ে বিদেশী নৌকা যায়। তারা কৌতূহলী হয়ে হাঁক দেয়, কোন গ্রাম?

সোহাগী?

বাঘাই সিনি নাকি গো?

হ ভাই।

কেমন জমল?

জব্বর।

হই হো হেই হো।

শুধু খোরাকির ধান রেখে বাকি সব ধান আজরফ নীলগঞ্জের হাটে বিক্রি করে দিল। শরিফা আপত্তি করছিল। কিন্তু আজরফ শক্ত সুরে বলল, ধান থাকলেই খরচ হইব–যে জিনিসের দরকার নাই, সেইটাও কিনা হইব।

যুক্তি অকাট্য। ইতোমধ্যেই নৌকা সাজিয়ে বেদেনীরা আসতে শুরু করেছে। শাড়ি চুড়ি থেকে শুরু করে পিঠা বানানর ছাঁচ–কী নেই তাদের কাছে? কিনতে কারোর গায়ে লাগে না। নগদ টাকা দেওয়ার ঝামেলা নেই, ধান দিলেই হয়।

আজরফ নীলগঞ্জের হাটে ধান বেচে কত টাকা পেল, তা শরিফা পর্যন্ত জানতে পারল না। শরিফা খুব বিরক্ত হল, কিন্তু নিজে থেকে জানতে চাইল না। টাকাপয়সার হিসাব পুরুষমানুষের কাছে থাকাই ভালো। আর এই সংসারে পুরুষ বলতে তো এখন আজরফই আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই যেন ছেলেটা বড়ো হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে চলাফেরা করে। যন্ত্রের মতো কাজ করে। নীলগঞ্জ থেকে সে এবার অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। নুরুদ্দিনের জন্যে এনেছে লুঙ্গি আর মাছ মারার বড়শি। তার এবং রহিমার জন্যে এসেছে শাড়ি। শরিফা দুঃখিত হয়ে লক্ষ করল, দুটি শাড়ির জমিনই এক রকম। দামও নিশ্চয়ই এক। রহিমা তার কে? থাকতে দেওয়া হয়েছে দয়া করে, এর বেশি আর কী? তার জন্যে সস্তার শাড়ি কি নীলগঞ্জের হাটে ছিল না? শুধু এখানেই শেষ নয়, অনুফার জন্যে সে একটা জামাও এনেছে। জামায় বড়ো বড়ো ছাপার ফুল। মেলা দাম নিশ্চয়ই।

বর্ষা এসে গেছে। ক দিন ধরেই ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাটে এক হাঁট কাদা। আজরফ ঘরেই বসে থাকে। করার তেমন কিছু নেই। আগামী পাঁচ মাস ধরে জোয়ান মর্দ ছেলেরা ফড় খেলবে, যোলকটি খেলবে। কেউ কেউ ফুর্তির খোঁজে চলে যাবে উজান দেশে। এই পাঁচ মাস বিশ্রামের মাস, ফুর্তির মাস।

শরিফা খবর পেল। আজরফ যাচ্ছে উজান দেশে। কী সর্বনাশের কথা। এইটুক ছেলে, সে যাবে উজানে? উজানের মেয়েগুলি ফষ্টিনষ্টিতে ওস্তাদ। কী থেকে কী হবে–কে জানে। তার

উপর বাজারের খারাপ মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লে ফতুর হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আজরফের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সে কাজকর্মের খোঁজে যাবে। উজান মুলুক থেকে কিছু টাকাপয়সা যদি আনা যায়, তাহলে ধানবেচা টাকার সঙ্গে যোগ করে জমি রাখা যাবে। শরিফা স্তম্ভিত।

আমরারে দেখাশোনা করব কে?

নূরা আছে। রহিমা খালা আছে, তারা দেখব।

শরিফা কাঁদে খুনখুন করে। আপন মনে বিড়বিড় করে, রক্তের মধ্যে দোষ। ঘরে মন টিকে না। রহিমাকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ছেলেডা কি বিয়া করতে চায়?

রহিমা মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, না বুজি।

হাস ক্যান রহিমা? হাসির কথা কিছু কই নাই। বিয়া যখন করতে চায় তখন পুলাডি এই রকম ঘর ছাড়নের ভয় দেখায়।

না বুজি, বিয়া করব কি। বাচ্চা পুলা।

আজরফকে এখন আর বাচ্চা পুলা বলা যায় না। গম্ভীর হয়ে দাওয়ায় যখন বসে থাকে, তখন শরিফার পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এর মধ্যে হঠাৎ মতি মিয়ার একটি চিঠি এসে উপস্থিত। শম্ভুগঞ্জ থেকে লেখা। আমিন ডাক্তার এসে চিঠি পড়ে দিয়ে যায় ও মদন থানার রাধাপুর ইউনিয়ন বোর্ডর প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়াছেন। মেডেলটি ছয়আনি ওজন---

মেডেলের ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। রূপার একটি মেডেল সাড়ে তিন টাকা খরচ করে মতি মিয়া নিজেই কিনেছে। আসরে নামার সময় গায়ে কোনো মেডেল না থাকলে লোকজনের ভক্তি পাওয়া যায় না। আমিন ডাক্তারকে চিঠিটি তিন-চার বার পড়ে শোনাতে হয়। সেরাত্রে তাকে খাওয়াদাওয়াও করতে হয়। ডাক্তার হৃষ্ট চিত্তে শরিফাকে বলে, বুঝছেন নি দোস্তাইন, মতি মিয়া কানা নিবারণরে ছাড়াইয়া যাইব কইয়া রাখলাম।

শরিফাকে এই সংবাদে খুব উল্লসিত মনে হয় না।

বর্ষার জন্যে অসুখবিসুখ হতে শুরু করেছে। পেট খারাপ, জ্বর–অসুখ বলতে এই দুটিই। মানুষের হাতে টাকা আছে। কিছু হতেই ডাক্তারের ডাক পড়ে। কাজেই আমিন ডাক্তারের ভালো সময় যাওয়ার কথা। কিন্তু তা যাচ্ছে না। বর্ষার আগে আগে নতুন এক জন ডাক্তার এসে পড়েছে।

এই অঞ্চলের লোকদের হাতে যখন টাকাপয়সা থাকে, তখন হঠাৎ করে শহুরে ডাক্তার এসে উদয় হয়। লোকদের টাকাপয়সা যখন কমে আসতে শুরু করে, তখন বিদেয় হয়। আগেও এরকম হয়েছে। এতে আমিন ডাক্তারের তেমন কোনো অসুবিধা হয় নি। সোহাগীর লোকজন পুরন ডাক্তারকেই ডাকে। কিন্তু এই বৎসর অসুবিধা হচ্ছে। নতুন যে ডাক্তার এসেছেন, তিনি সোহাগীর লোকজনদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ডাক্তারটির নাম শেখ ফজলুল করিম। এসেছেন মোহনগঞ্জ থেকে। সেখানে ডাক্তার সাহেবের বড়োফার্মেসি আছে– শেখ ফার্মেসি। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে যে এ্যাসিসটেন্ট এসেছে, সে আরেক বিস্ময়। লোকটির বাড়ি জৌনপুরে। বাংলা বলতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার সাহেবের ঘরের উঠোনে বসে সুর করে তুলসীদাসের রামচরিতমানস পড়ে। ডাক্তার সাহেব নিজেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করেন নি। তিনি সঙ্গে একটি ঘোড়া নিয়ে এসছেন। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে ঘোড়া কী কাজে লাগবে। জিজ্ঞেস করলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলেছেন– শীতকালের জন্যে ঘোড়া আনা হয়েছে। তার মানে লোকটি শুধু বর্ষার সময়ের জন্য আসে নি, দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মধুর স্বভাব। ক দিন হয় এসেছেন, এর মধ্যেই গ্রামের সবার নাম-ধাম জানেন। দেখা হলেই খোঁজখবর করেন। অষুধের জন্য গেলে প্রথমেই বলেন–বিনা পয়সায় অষুধ দিতে পারি। কিন্তু অযুধে কাজ হবে না। পয়সা দিয়ে অষুধ নিলে তবেই অষুধ কাজ করে। গ্রামের সবার ধারণা, কথাটি খুব লেহ্য।

ডাক্তার সাহেবের কাছে সপ্তাহে একটি কাগজ আসে–দেশের ডাক। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই কাগজ পড়ে শোনান। পড়া শেষ হলে চিন্তিত মুখে বলেন, ইস, দেশের সর্বনাশের আর বাকি নাই। গ্রামের লোকজন সর্বনাশের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়।

আমিন ডাক্তার মহা বিপদে পড়ে গেল। রুগীপত্তর একেবারেই নেই। পাওনা টাকাপয়সাও কেউ দিচ্ছে না। সোহাগীর লোকজন যেন ভুলেই গেছে এই গ্রামে আমিন ডাক্তার নামে পুরনো এক জন ডাক্তার আছে। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অনেক ফন্দিফিকির করে, কোনোটোই কোন কাজে আসে না। যেমন– এক দিন সকালে সেজেগুজে গম্ভীর

মুখে তার ব্যাগ হাতে বেরুল। যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই বলল, নিমতলি থেকে কল এসেছে, রুগীর অবস্থা এখনতখন, আমিন ডাক্তারকে ছাড়া ভরসা পাচ্ছে না। বিশেষ করে নিমতলির কথা বলার কারণ হচ্ছে–নিমতলিতে সিরাজুল ইসলামের মতো নামী ডাক্তার থাকেন।

আষাঢ় মাসের গোড়াতেই আমিন ডাক্তার মহা মুসিবতে পড়ল। না-খেয়ে থাকার যোগাড়। এক দিন চৌধুরী সাহেব এসে দেখেন আমিন ডাক্তার দুপুরবেলা শুকনো চিড়া চিবাচ্ছে। তিনি বড়ই অবাক হলেন। ভাটির দেশে ভাতের অভাব নেই, আর এখন সময়টাই হচ্ছে ফেলে-ছড়িয়ে খাবার। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোজগারপাতি কেমুন ডাক্তার?

ইয়ে, আছে কোন মত।

হুঁ।

কলেরা শুরু হইলে কিছু বাড়ব। অখন কম।

চৌধুরী সাহেব যাবার আগে বলে গেলেন, সে যেন অতি অবশ্যি আজ রাত থেকে দু বেলা তার ওখানে খায়। আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে গেল নতুন ডাক্তার শেখ ফজলুল করিম সাহেবের কাছে। দেশের ডাক কাগজটি এসেছে। সেইটি পড়া হচ্ছে। প্রচুর লোকজন ঘরে। ফজলুল করিম সাহেব আমিন ডাক্তারকে খুব খাতির করলেন। আমিন ডাক্তার এক পর্যায়ে বলল,

আপনের কাছে একটা পরামর্শের জইন্যে আসলাম ডাক্তার সাব।

কী পরামর্শ?

এই গ্রামে একটা ইস্কুল দিতাম চাই।

আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি স্কুল কি দেবেন।

ডাক্তারী আমি করতাম না। আমার চেয়ে ভালা ডাক্তার ওখন এই গ্রামেই আছে।

লোকজনকে অবাক করে দিয়ে আমিন ডাক্তার উঠে পড়ল। অনেক রাত্রে প্রথম বারের মতো খেতে গেল চৌধুরীবাড়ি। ছোট চৌধুরী বসে ছিল বারান্দায়।

তার গায়ে একটি সূতাও নেই। আমিন ডাক্তারকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, এই শালা আমিন, তরে আজই আমি খুন করবাম। শালা তুই আমারে দেইখ্যা হাসছস। শালা তর বাপের নাম আজই ভুলাইয়া দিয়াম।

৯. বর্ষার প্রধান প্রস্তুতি শেষ

বর্ষার প্রধান প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

সোহাগীর চারপাশে বাঁশ পুঁতে চইল্যা গাছ ঢুকিয়ে মাটি শক্ত করা হয়েছে। প্রবল হাওয়ায় যখন হাওড়ের পানি এসে আছড়ে পড়বে, সোহাগীতে তখন যেন মাটি ভেঙে না পড়ে।

উত্তর বন্দ সবচেয়ে নিচু। সেটি ডুবল সবার আগে। তারপর এক দিন সকালে সোহাগীর লোকজন দেখল যেন মন্ত্রবলে চারদিক ডুবে গেছে। থৈথৈ করছে জল। হুমম শব্দ উঠছে হাওড়ের দিক থেকে। জংলা ভিটার বাঁশ আর বেত-বনে প্রবল হাওয়া এসে সারাক্ষণ বোঁ-বোঁ শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে। চিরদিনের চেনা জায়গা হঠাৎ করে যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আদিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্যে হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে সবুজ রঙের ছোট্ট সোহাগী। নাইওরিদের আসবার সময় হয়েছে।

গভীর রাত্রে হাওড়ের নৌকার আলোগুলি কি অদ্ভুতই না লাগে। বিদেশী নায়ের মাঝিরাও লোহাগীর দিকে অবাক হয়ে ঢাকায়।

টেনে টেনে জিজ্ঞেস করে– কোন গ্রাম? কো-ও-ও-ন-গ্রা—ম?

সোহাগী, গ্রামের নাম সোহাগী।

চারদিকের অথৈ জলের মাঝখানে ছোট্ট গ্রামটি ভেসে থাকে। চৌধুরীবাড়ির লোকজন সাদা কেরোসিন তেলের হারিকেন জ্বালিয়ে সারা রাত হিজল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গভীর

রাত্রে যখন গ্রামের সব আলো নিভে যায় তখন সেই আলো মিটমিট করে জ্বলে। দূর থেকে সেই আলো দেখে সোহাগীর নাইওরি মেয়েরা আহ্লাদে নৌকা থেকে চেচিয়ে ওঠে, ওই আমার বাপের দেশ, ওই দেখা যায় চৌধুরীবাড়ির লণ্ঠন। গাঢ় আনন্দে তাদের চোখ ভিজে ওঠে।

ছেলেপুলেদের আনন্দের সীমা নেই। এখন বড়োই সুসময়। পানিতেই তাদের সারা দিন কাটে। এখন ডিঙি নৌকা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। বরং খুশি হবে। পানির সঙ্গে পরিচয় হোক। এক দিন এদেরকেই তো ঝড়ের রাত্রে একা-একা হাওড় পাড়ি দিতে হবে।

আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির একটি অন্ধকার কোঠায় তার স্কুল সাজিয়ে বসে থাকে। প্রথম দিনে গোটা কুড়ি ছাত্র ছিল, এখন এসে ঠেকেছে দুই জনে। কালাচানের ছোট ছেলে বাদশা মিয়া আর কৈবর্তপাড়ার গণেশ। অন্য ছাত্ররা পড়ে থাকে হাওড়ের পানিতে। কার দায় পড়েছে আমিন ডাক্তারের অন্ধকার ঘরে বসে থাকার? দুটি ছাত্রকে নিয়েই আমিন ডাক্তার মহা উৎসাহে লেগে থাকে। বাদশা মিয়া বোকার হন্দ। আমিন ডাক্তার যখন কয়ের উপর আল রেখে জিজ্ঞেস করে এইটা কী? বাদশা মিয়া তখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে বলে, স্বরে আ। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড চড় লাগায়, কিন্তু বাদশা মিয়ার বিদ্যার্জনের স্পৃহা সীমাহীন। সে পরদিন আবার শ্লেট-পেনসিল নিয়ে হাজির হয়। অন্য দিকে গণেশের পড়াশোনায় খুব মন। তাকে পড়াতে বড়ো ভালো লাগে। কী চমৎকার, বলামাত্রই সব শিখে ফেলে। দ্বিতীয় বার আর বলতে হয় না। কী সুন্দর গোটাগোটা হাতের লেখা।

চৌধুরীবাড়ি খেতে যেতে এখন আর আগের মতো লজ্জা লাগে না। চৌধুরীদের পাগলা ছেলের বৌটা খুব যত্ন করে। পর্দার আড়াল থেকে মধুর স্বরে বলে, আরেকটু মাছ নেন চাচাজী।

আর না মা।

না চাচাজী নেন। আরেক টুকরা নেন।

তাকে মাছ নিতেই হয়।

ইঁচা মাছ আর চোকাইয়ের তরকারি কোন দিন খাইছেন চাচাজী?

না মা, খাই নাই।

খুব সুআদ। আমার বাপের দেশে করে।

এক দিন কইরো।

জ্বি আইচ্ছা।

তোমার বাপের দেশ কোথায়?

বহুত দূর। গাঁয়ের নাম বেতসি। নবীনগর ইউনিয়ন।

ভাটি অঞ্চল? জ্বি না, উজান দেশ।

খাওয়ার পর পান আসে। একটা কামলা এসে তামাক সাজিয়ে দিয়ে যায়। পর্দার আড়াল থেকে বৌটি বলে, পেট ভরছে চাচাজী?

আলহামদুলিল্লাহ্, খুব খাইছি।

আপনের যেটা খাওনের ইচ্ছা হয় আমারে কইবেন।

বৌটিকে আমিন ডাক্তারের খুব দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চৌধুরীবাড়ীর পর্দা বড় কঠিন পর্দা। দেখা হয় না। ভাত খেয়ে ফেরার পথে চৌধুরীর পাগল ছেলেটার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। ছেলেটি হুঙ্কার ছাড়ে, কে যায়? আমিন ডাক্তার। এই শুওরের বাচ্ছা, এদিকে আয় তো।

আমিন ডাক্তার না-শোনার ভান করে এগিয়ে যায়। পাগলটা দারুণ হৈ-চৈ শুরু করে, এই শালা কথা কস না যে, এই শালা।

বৌটার কথা চিন্তা করে আমিন ডাক্তারের বড়োই খারাপ লাগে। রোজ ভাবে চৌধুরী সাহেবকে বলে ছেলেটাকে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বলা আর হয় না।

ভাদ্র মাসে হঠাৎ মতি মিয়া ফিরে এল। তার গায়ে দামী একটা চাদর। মাথায় ঢেউখেলান বাবড়ি চুল। হলুদ রঙের একটা মটকার পাঞ্জাবিতে দুটি রূপার মেডেল ঝুলছে। মেডেল

দুটির মধ্যে একটি সে সত্যি সত্যি পেয়েছে। কেরানিগঞ্জের এক বেপারি খুশি হয়ে দিয়েছে। মতি মিয়া এখন নাকি বড়ো গাতক।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে লোকজন ভিড় করে।

মতি ভাই, এটু গান-বাজনা হউক। হুনলাম উজান দেশে তোমারে লইয়া কাড়াকাড়ি।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে। শইল আইজ যুইত নাই। আইজ না।

বলামাত্রই এখন আর গানে টান দেওয়া যায় না। বড়ো গায়কদের মান থাকে না তাতে। বড় গাতকদের গান সাধ্য-সাধনা করে শুনতে হয়।

একখান গাও মতি ভাই।

কাইল আইও, নিজের বান্দা গান হুইয়াম।

নিজে গান বান্দ? কও কি মতি ভাই।

মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে থাকে। গ্রামের লোক বড়োই চমৎকৃত হয়।

কাইল কিন্তু বেবাক রাইত গান অইব, কী কও মতি ভাই? চানি রাইত আছে। বেবাক রাইত গান। বুদ্ধিটা কেমুন?

দেখি।

চেষ্টাকৃত একটা গাম্ভীর্য বহু কষ্টে মতি মিয়াকে ধরে রাখতে হয়।

পরের রাতে মতি মিয়ার বাড়িতে কিন্তু কেউ আসে না, কারণ সন্ধ্যার কিছু আগে কোন খবর না দিয়ে কানা নিবারণ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে, আজ রাতটাই শুধু থাকবো চৌধুরীদের আলায়বসেছে গানের আসর। ছেলেবুড়োসবসন্ধ্যা থেকেই বলা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এক সময় কানা নিবারণ গানে টান দিল। গ্রাম্য দুঃখী মেয়ের চিরকালের গান। শ্রাবণ মাস চলে গিয়েছে, ভাদ্র মাসও যায় যায়–তবুও তো নৌকা সাজিয়ে বাপের দেশ থেকে আমাকে কেউ নাইওর নিতে এল না।

গানের মাঝখানে একটি অল্পবয়েসী বউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেয়েটিকে এ বৎসর কেউ নিতে আসে নি। তাকে কাঁদতে দেখে অনেকেই চোখে আঁচল দিল। কিন্তু কানা নিরণকে এই সব কিছুই স্পর্শ করছে না। সে সমস্ত জাগতিক ব্যথাবেদনার উর্ধ্বে। ফকফকা জ্যোৎস্নায় গ্রামের সমস্ত দুঃখী বউ-ঝিরা কানা নিবারণের মধ্য দিয়ে তাদের চিরকালের কান্না কাঁদতে লাগল–

শ্রাবণ মাস গেছে গেছে ভাদ্র মাসও যায়।
জানি না কি ভাবেতে আছে আমাব বাপ ও মায়।

মতি মিয়া তার বাড়ির উঠোনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আজ রাতে সোহাগীর মানুষের আর তাকে প্রয়োজন নেই। রহিমা এক সময় এসে বলল, ভাত দেই মতি ভাই?

নাহ্, খিদা নাই। তুমি গান শুনতে গেলা না?

রহিমা কথা বলল না। মতি মিয়া ধরাগলায় বলল, যাও, কানা নিবারণের গান হুন গিয়া। বড়ো ওস্তাদ লোক। তার মতো গায়ক আর হইত না।

মতি মিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সে দিন দশেক থাকবে ভেবে এসেছিল, কিন্তু থাকল না। পরদিন ভোরেই শম্ভুগঞ্জ চলে গেল।

১০. জংলা ভিটায়

জংলা ভিটায় এখন আর যাওয়া যায় না।

নাবাল জায়গা। আষাঢ় মাসের গোড়াতেই পানি উঠে গেছে। দক্ষিণ কান্দা দিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে জলমগ্ন ভিটার আশেপাশে যাওয়া গেলেও এখন আর কেউ যায় না। দক্ষিণ কান্দায় খুব সাপের উপদ্রব হয়েছে। সিরাজ মিয়ার একটি বকনা বাছুর সাপের হাতে মারা পড়েছে।

তবু নূরুদ্দিন জংলা ভিটায় যাবার জন্যে এক সকালে লালচাচীর বাড়ি এসে উপস্থিত। লালচাচীর খোন্দা নিয়ে সে যাবে জংলা ভিটায়। তার সঙ্গে গোটা দশেক লার বড়শি। বড়শি কটি পেতে দিয়েই সে চলে আসবে। লালচাচী চোখ কপালে তুলে বলল, তোর মাথাডা পুরা খারাপ নুরা। এই চিন্তা বাদ দে।

লালচাচী নুরুদ্দিনের কোনো যুক্তিই কানে তুলল না। ব্যাপারটিতে যে ভয়ের কিছুই নেই, খোন্দায় বসে থাকলে সাপখোপ যে কিছুই করতে পারবে না, লালচাচীকে তা বোঝা গেল না। লালচাচী খুব রেগে গেল, এক কথা এক শ বার কইস না নুরা। আমারে চেইস না। আমার মন-মিজাজ ঠিক নাই।

তাঁর মন-মেজাজ ঠিক নেই -কথাটি খুব সত্যি। গুজব শোনা যাচ্ছে, সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করবে। মেয়ে নিমতলির, নফিস খাঁর ছোট মেয়ে। সিরাজমিয়াকেও দোষ দেওয়া যায় না। যখন বিয়ে করে, তখন সে কামলা মানুষ। সরকার বাড়ি জন খাটত। ছোট ঘরের

মেয়ে ছাড়া কামলা মানুষের কাছে কে মেয়ে দেবে। সেই দিন আর এখন নেই। নতুন ঘর তুলেছে সিরাজ মিয়া। এই বৎসর টিনের ঘর। দেবে। এক বান টিন কেনা হয়েছে।

এ ছাড়াও একটি কারণ আছে। সিরাজ মিয়ার এখনো কোনো ছেলেপুলে হয় নি। তিনটি বাচ্চা আতুর ঘরে মারা গিয়েছে। অনেকের ধারণা সিরাজ মিয়ার বৌয়ের উপর জ্বীনের আছর আছে। লক্ষণ সব সেই রকম। প্রথমত সে অত্যন্ত রূপসী। বাছবিচারও নেই। ভরসন্ধ্যায় অনেকেই তাকে এলোচুলে ঘরে ফিরতে দেখেছে।

সিরাজ মিয়া অবশ্যি বিয়ের প্রসঙ্গে কিছুই বলে না। তবে তার হাবভাব যেন কেমন কেমন। ইদানীং সে প্রায়ই নিমলি যায়। নৌকা বাইচের ব্যাপারেই নাকি তার যাওয়া লাগে। কিন্তু দৌড়ের নৌকা নিয়ে যাবার সময় কেউ কি নয়া শার্ট গায়ে দেয়?

লালচাচী নুরুদ্দিনকে বিকাল পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। যত বারই নুরুদ্দিন উঠতে চায়, তত বারই সে তাকে টেনে ধরে বসায়। নতুন এই সমস্যায় কী করণীয়, সেই ব্যাপারে পরামর্শ চায়। যেন নুরুদ্দিন খুব এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি। নুরুদ্দিন বড়দের মত গম্ভীর গলায় বলে, চাচারে পান-পড়া খাওয়া।

পান-পড়ার কথা লালচাচীর অনেক বার মনে হয়েছে, কিন্তু এ গ্রামে পানপড়া দেওয়ার লোক নেই। ভিন গ্রাম থেকে আনতে হবে। লোক জানাজানির ভয়ও আছে। লালচাচী হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুই আইন্যা দিতে পারবি? সুখানপুকুরে এক জন কবিরাজ হুনছি পান-পড়া দেয়।

আইচ্ছা।

একলা যাওন লাগব কিন্তুক।

আইচ্ছা।

কেউরে কওন যাইত না। কাকপক্ষীও যেন না জানে।

কেউ জানত না।

নুরুদ্দিনের বড় মায়া লাগে। লালচাচীর যে আবার বাচ্চা হবে, তা সে জানত। না। চোখ-মুখ সাদা হয়ে গেছে, হাত-পা ভারি হয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়ে এখন যেন আরো সুন্দর দেখায়, শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছা হয়। লালচাচী বলল, হা কইরা কী দেখস?

তোমার বাচ্চা হইব চাচী?

কথার ঢং দেখা চুপ থাক।

নুরুদ্দিন এক বার শেষ চেষ্টা করে চাচী, দেও না তোমার খোন্দাটা। যাইয়াম আর আইয়াম।

আইচ্ছা যা। দেইখ্যা আয়তর জংলা ভিটা। দিরং করি না।

দিরং হইত না।

খোন্দায় উঠবার মুখে নুরুদ্দিন দেখল সোহাগীর দল তাদের বাইচের নৌকা নিয়ে মহড়া দিতে বেরিয়েছে। সিরাজ চাচা মাথায় একটি লাল গামছা বেঁধে নৌকার আগায়। নৌকা ছুটছে তুফানের মতো। গানের কথা শোনা যাচ্ছে—

ওগো ভাবীজান, বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম
ওগো ভাবীজান, বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।

এই বারের বাইচে দুইটি খাসি এবং একটি গরু দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের সাতটি গ্রামের মধ্যে কম্পিটিশন। ভাবসাব যা দেখা যাচ্ছে, এ বৎসর সোহাগীর দল বোধহয় জিতেই যাবে।

জংলা ভিটাকে আর চেনা যায় না। পানিতে ডুবে একাকার। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ। বাঁশের ঝোপ আরো যেন ঘন হয়েছে। চারদিক দিনমানেই অন্ধকার। জংলা ভিটা ডুবিয়ে পানি ডেফল গাছের গুড়ি পর্যন্ত উঠেছে। খালের মাঝামাঝি লম্বা জলজ ঘাস জন্মেছে। সেই সব ঠেলে খোন্দা নিয়ে এগোনই যায় না। নুরুদ্দিন ভেসে বেড়াতে লাগল। এক জায়গায় দেখা গেল চার-পাঁচটি থইরকল গাছ। এখানে থইরকল গাছ আছে, তা কোনো দিন তার চোখেই পড়ে নি। থোকা থোকা। থইরকল পেকে লাল টুকটুক করছে। কী আশ্চর্য! নুরুদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

এই সময় অদ্ভূত একটি কাণ্ড হল। হঠাৎ চার দিক সচকিত করে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক একসঙ্গে কা-কা করে উড়ে গেল। উত্তর দিকের ঘন বাঁশবনে হাওয়ার একটা দমকা ঝাপটা বিচিত্র একটি হা-হা শব্দ তুলল। তার পরপরই নুরুদ্দিন শুনল একটি

অল্পবয়সী মেয়ে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিচুপ। গাছের পাতাটিও নড়ে না। চারদিক শুনশান।

নুরুদ্দিন ভয়কাতর স্বরে বলল, কে গো, কেডা?

আর তখন তার চোখে পড়ল জংলা বাড়ির ভিটার কাছে যেখানে জলশ্যাওলায় ঘন সবুজ হয়ে আছে, সেখানে মাথার চুল এলিয়ে উপুড় হয়ে মেয়েটি ভাসছে। অসম্ভব ফর্সা, তার একটি হাত ছড়ান। হাতভর্তি গাঢ় রঙের ছড়ি। এই সময় প্রবল একটা বাতাস এল। মেয়েটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে লাগল নুরুদ্দিনের দিকে। যেন ডুবসাঁতার দিয়ে ধরতে আসছে তাকে।

আকাশ-পাতাল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল নুরুদ্দিন। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। চোখ গাঢ় রক্তবর্ণ। লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। আমিন ডাক্তার এসে যখন জিজ্ঞেস করল, কী হইছে নূরু?

নুরু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

কী হইছে ক দেহি নুরু?

ভয় পাইছি চাচা। কী দেখছস?

একটা মেয়েমানুষ সাঁতার দিয়া আমারে ধরতে আইছিল। হাতের মইধ্যে লাল চুড়ি।

প্রচণ্ড ঝড় হল সেই রাত্রে। ঘনঘন বিজলি চমকাতে লাগল। কালাচাঁন খবর আনল নিমতলির দোষ-লাগা তালগাছে বজ্রপাত হয়েছে।

পরদিন আমিন ডাক্তার নৌকা নিয়ে সারা দুপুর জংলা বাড়ির ভিটায় ঘুরে বেড়াল। কোথায়ও কিছু নেই। থইরকল গাছগুলি দেখে সেও নুরুদ্দিনের মতোই অবাক হল। উজান দেশের গাছ। ভাটি অঞ্চলে কখনো হয় না। গাছগুলিতে গাঢ় লাল রঙের ফল টুকটুক করছে। আমিন ডাক্তার আরো একটি জিনিস লক্ষ করল, জংলা বাড়ির ভিটা পানিতে ডুবে গেছে। কোনো বৎসর এরকম হয় না।

সোহাগীতে রটে গেল পাগলা নুরা রাসন্ধ্যায় গিয়েছিল জংলা বাড়ির ভিটাতে। গিয়ে দেখে পরীর মত একটা মেয়ে নেংটা হয়ে সাঁতার কাটছে। নুরাকে দেখে সেই মেয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডুবসাঁতার দিল।

নুরুদ্দিনের জ্বর সারতে দীর্ঘদিন লাগল। নিমতলির পীর সাহেব নিজে এসে তাবিজদিলেন। গৃহবন্ধন করলেন। বারবার বলে গেলেন আর যেন কোন দিন জংলা ভিটায় না যায়। জায়গাটাতে দোষ হয়েছে। নিমতলির তালগাছে যে থাকত সে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। জংলা ভিটায় এসে তার আশ্রয় নেওয়া বিচিত্র নয়।

১১. সোহাগীতে পানি ঢুকছে

সোহাগীতে পানি ঢুকছে, এই ভয়াবহ খবরটি চৌধুরীদের পাগল ছেলে প্রথম টের পেল। তার রাতে ঘুম হয় না। বাংলাঘরের বেঞ্চিতে বসে সিগারেট টানে এবং কোনো রকম শব্দ হলেই চেঁচায়, কেডা? চোর নাকি? এই চোর, এই চোর। এ্যাইও। তার চেঁচামেচি চলে ভোের পর্যন্ত। ফজরের আজানের পর সে ঘুমাতে যায়। দুপুর পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

সেই রাত্রে সে উঠোনে পাটি পেতে শুয়ে ছিল এবং তার স্বভাব মতো চোর চোর বলে কেঁচাতে-চেঁচাতে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সমস্ত উঠোনে থৈথৈ পানি। শোঁ-শী শব্দ উঠছে। শেয়াল ডাকাডাকি করছে চারদিকে। সে প্রথম কয়েক মহর্ত কিছুই বুঝতে পারল না। তার নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেঁচাল, কে, চোর নাকি? এই শালা চোর? এ্যাইও। তার পরমুহূর্তেই পানি আসে পানি আসে বলে বিকট চিৎকার করে ছুটতে শুরু করল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের ঘোড়াটি বিকৃত স্বরে চেঁচাতে শুরু করল। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের গোয়াল ঘরগুলি থেকে গরু ডাকতে লাগল। বেশির ভাগ মানুষ জেগে উঠল এই সময়। ছোট মসজিদের ইমাম সাহেব রাত সাড়ে তিনটায় আযান দিলেন। অসময়ের আযান–মহাবিপদের সংকেত দেয়। লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সরকারবাড়ি থেকে সরকার সাহেব দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোনালা বন্দুক থেকে চার বার ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ঘোট ঘোট ছেলেমেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করল।

আমিন ডাক্তার যখন ঘর থেকে বেরুল, তখন তার উঠোনে প্রায় হাঁটু-পানি। এই রকম অসম্ভব ব্যাপার সোহাগীর মানুষ কখনো দেখে নি। ভাটি অঞ্চলে পানি এত দ্রুত ্কখনো

বাড়ে না। আর বাড়লেও পানি এসে বাড়ির উঠোনে কখনো ঢোকে না। আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ি এসে দেখে ইতোমধ্যেই প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। একটি হ্যাজাক লাইট উঠোনের জলচৌকির উপর বসান। চৌধুরী সাহেব গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁকডাক করছেন। —

মেয়েছেলেগুলিরে সরকারবাড়িত লইয়া যাও। গরু-ছাগলের দড়ি কাট, জান বাঁচানির চেষ্টা কর। ভোর মত চাইয়া থাইক্য না।

আমিন ডাক্তার দৌড়াতে শুরু করল। মতি মিয়ার বাড়ি যাওয়া দরকার। পুরুষমানুষ কেউ নেই সেখানে। শরিফা সেরকম হাঁটাচলাও করতে পারে না। এতক্ষণ সে কথা মনেই হয় নি।

মতি মিয়ার বাড়ির উঠোনে অনেকখানি পানি। দক্ষিণ কান্দার একটি অংশ ভেঙে সরসর করে পানি ঢুকছে। উঠোনের বাঁ দিকটা নিচু। সেখানে জলের একটা প্রবল ঘূর্ণি উঠেছে। আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে ঢুকে বেশ অবাক হল। রহিমা সবকিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে ফেলেছে। হাস-মুরগি গরু-ছাগল সমস্তই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চৌকির নিচে ইট দিয়ে অনেকখানি উঁচু করে তার উপর ধান রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় একটি বড় পোঁটায় রাখা হয়েছে। শরিফা চৌকির এক কোণায় বসে বসে কাঁদছিল। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, অখন। কান্দনের সময় না, দোস্তাইন। সরকারবাড়িত যাওন লাগব।

আমি কেমনে যাই।

নেওনের ব্যবস্থা করছি। অখন শরমের সময় না। হাতটা ধরেন দেহি।

সরকারবাড়ি কিন্তু যাওয়া গেল না। দক্ষিণ কান্দার ভাঙা অংশে জলের চাপ খুব বেশি। সরকারবাড়ি যেতে হলে ভাঙা জায়গাটা পেরুতে হয়। কৈবর্তপাড়ার জেলেরা সবাই চলে এসেছে দক্ষিণ কান্দায়। অনেকগুলি কুপি জ্বলছে সেখানে। চাটাই বিছিয়ে মেয়েরা সব উচ্চৈঃস্বরে কলরব করছে। শরিফাকে ওদের কাছে বসিয়ে রেখে আমিন ডাক্তার রহিমাকে আনতে গেল। রহিমা খুন্তি দিয়ে গভীর মনযোগের সঙ্গে ঘরের ভেতরে কী যেন খুঁজছে। আমিন ডাক্তারকে দেখে সে শান্ত স্বরে বলল, আজরফ এইখানে ধান বেচা টেকা লুকাইয়া রাখছে। পানি উঠলে সব নষ্ট হইব।

আমিন ডাক্তার বেশ অবাক হল, তোমারে কইছিল যে এইখানে লুকাইছে?

না।

তুমি জানলা কেমনে?

রহিমা জবাব দিল না। একমনে খোঁড়াখুড়ি করতে লাগল।

ডাক্তার ভাই।

কি?

আপনে অনুফা আর নুরুদ্দিনরে লইয়া যান, আমার দিরং হইব।

অনুফা নুরুদ্দিনের সঙ্গে চৌকিতে বসে খোঁড়াখুড়ি দেখছিল।

সে মৃদুস্বরে বলল, হগলে মিল্যা একসাথে যাইয়াম চাচা।

খুঁতিতে বাঁধা টাকা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। রহিমা বলল, আপনার কাছে রাখেন ডাক্তার ভাই।

আমার কাছে কেরে?

মেয়েমাইনষের হাতে টেকা থাকন নাই। দোষ হয়।

দক্ষিণ কান্দায় তারা যখন পৌঁছল, তখন পুব দিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। কান্দার পশ্চিম পাশে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মিলে খুব হৈচৈ করছে। কৈবর্তদের একটি ছেলে দৌড়াদৌড়ি করছিল, পা পিছলে নিচে পড়েছে-তাকে তুলে এনে শক্ত মার লাগান হচ্ছে। কৈবর্তদের প্রবীণ নরহরি দাস তামাক টানছে আর বলছে,

শক্ত মাইর দেও। খুব শক্তে দেও। তামশা পাইছে।

আমিন ডাক্তার বলল, ও নুরা, তোর মারে খুইজ্যা বাইর কর, খবরদার কান্দার কিনারাত যাইস না। এক চড় দিয়া দাত ফালাইয়া দিয়াম।

নুরুদ্দিন অনুফার হাত ধরে চক্ষের নিমিষে ছুটে গেল। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, কারবারটা দেখছনি রহিমা, না করলাম যেটা, হেইটা করন চাই।

রহিমা মৃদুস্বরে বলল, আপনেরে একটা কথা কইম চাই।

কী কথা?

কথাডা আপনি কিন্তুক রাখবেন আমিন ভাই।

আমিন ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, বিষয় কী?

অনুফারে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে পাঠাইতাম চাই। হেইখানে ইস্কুলকলেজ আছে। লেহাপড়া শিখব।

আইজ হঠাৎ এই কথা কী কও?

ডাক্তার ভাই, পানি নামলে এইহানের অবস্থা খুব খারাপ হইব, আজরফের দুইডা পেট চালানর ক্ষ্যাম থাকত না।

তুমি তো অনেক দূরের কথা কও রহিমা।

নাহ্ ডাক্তার ভাই, দূরের কথা না।

নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে খিরিষ্টান হওন লাগে। হেই কথাডা জান তো?

জানি।

তুমি চিন্তাডা এট্টু বেশি করতাছ রহিমা। এই পানি থাকত না–যেমন হঠাৎ আইছে, হেই রকম হঠাৎ যাইব।

ডাক্তার ভাই, এই পানি মেলা দিন থাকব।

কান্দার ঠিক মাঝখানে কারা যেন একটা আগুন করেছে। দুর্যোগের সময় মানুষ প্রথমে অকারণেই একটা আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে। আজকের এই আগুনের অবশ্যি প্রয়োজন ছিল। ভেজা গা শুকোতে হবে, তা ছাড়া বিলের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমিন ডাক্তার দেখল, ফজলুল করিম সাহেব আগুনের কাছে এসে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। তাঁর ঘরের কাছেই সরকারবাড়ি।

এই যে, ও ভাই আমিন ডাক্তার, এ কী অবস্থা?

অবস্থাটা খারাপই, আপনে এত দূরে আসলেন।

আমার ঘোড়ার খোঁজে আসছি। মরেই গেছে নাকি, কী বিপদ দেখেন তো!
পাইছেন ঘোড়া?
কই পাব বলেন? ছিঃ ছিঃ, মানুষ থাকে এইখানে।

নুরুদ্দিন আর অনুফা জারুল গাছের গুড়িতে চুপচাপ বসে আছে। গাছটি কান্দার ধার ঘেঁষে উঠেছে। নিচে তাকালেই পানির ঘোলা আবর্ত চোখে পড়ে। শরিফা বেশ কয়েক বার ডাকল, নুরু, অত পানির ধারে থাকিস না। কাছে আইসা ব।

নুরু গা করে না। ফিসফিস করে অনুফাকে কী যেন বলে, অনুফা খিলখিল করে হেসে ওঠে। শরিফা ধমকে ওঠে, হাসিনা। খবরদার। বিপদের মইধ্যে হাসি। কিছুই তর মায় তরে শিখায় নাই?

ভোরবেলা দেখা গেল ঘোলা পানি কান্দা দুই-চুই করছে। নরহরি দাস মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছাব্বিশ সনের বানের লাখান লাগে গো।

কৈবর্তদের চারটি নৌকা জারুলগাছের গুড়িতে শক্ত করে বাঁধা। আমিন ডাক্তার বেশ কয়েক বার বলেছে, নৌকাতে করে সবাইকে সরকারবাড়িতে নিয়ে যেতে। সরকারবাড়ি অনেকখানি উঁচুতে। তাছাড়া পাকা দোতলা বাড়ি। মেয়েছেলেরা সবাই দোতলায় থাকতে পারবে। কৈবর্ত রাজি নয়। তারা দক্ষিণ কান্দাতেই থাকতে চায়।

সারা রাত ঝড়-বৃষ্টি কিছুই হয় নি। সকালবেলা দেখা গেল, আকাশে ঘন কালো মেঘ। দুপুরের পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। নরহরি দাস চিন্তিত মুখে বারবার বলতে লাগল, গতিক খুব খারাপ। ভগবানের নাম নেন গো।

বিকালের দিকে বৃষ্টির চাপ কিছু কমতেই দেখা গেল ছোট ঘোট খোন্দা নিয়ে সরকারবাড়ির কামলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারবাড়ির ছোট বৌ নাকি পানিতে পড়ে গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল। রাত প্রথম পহর পোহাবার আগেই কান্দার উপর আধ হাত পানি।

পানি থাকল সব মিলিয়ে ছ দিন। এতেই সোহাগীর সর্বনাশ হয়ে গেল।

১২. ভাত না খেয়ে বাঁচার রহস্য

ভাত না খেয়ে বাঁচার রহস্য সোহাগীর লোকজনের জানা নেই। চৈত্র মাসের দারুণ অভাবের সময়ও এরা ফেলে-ছড়িয়ে তিন বেলা ভাত খায়। এবার কার্তিক মাসেই কারো ঘরে এক দানা চাল নেই। জমি ঠিকঠাক করার সময় এসে গেছে। বীজধান দরকার। হালের গরু দরকার। সিরাজ মিয়ার মতো সম্ভ্রান্ত চাষীও তার কিনে রাখা ঢেউটিন জলের দামে বিক্রি করে দিল।

ঘরে ঘরে অভাব। ভেজা ধান শুকিয়ে যে-চাল করা হয়েছে সে-চালে উৎকট গন্ধ। পেটে সহ্য হয় না। মোহনগঞ্জ থেকে আটা এসেছে। আটার রুটি কারোর মুখে রোচে না। কেউ খেতে চায় না। লগ্নির কারবারীরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতে শুরু করল।

ঠিক এই সময় কলেরা দেখা দিল। প্রথম মারা গেল ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেবের কম্পাউণ্ডারটি। হাতির মত জোয়ান লোক দু দিনের মধ্যেই শেষ। তার পরদিনই একসঙ্গে পাঁচ জন অসুখে পড়ল। আমিন ডাক্তার দিশাহারা হয়ে পড়ল। অষুধপত্র নেই। খাবার নেই। কী ভাবে কী হবে?

রাতে ঘর বন্ধ করে বসে থাকে সবাই। ওলাউঠার সময় খুবই দুঃসময়। তখন বাইরে বেরোলে রাত-বিরাতে বিকট কিছু চোখে পড়তে পারে। চোখে পড়লেই সর্বনাশ।

ডাক্তার ফজলুল করিম সাহেব কলেরা শুরু হওয়ার চতুর্থ দিনে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিন ডাক্তারের কাছে অষুধপত্র নেই। নিমতলির সিরাজুল ইসলামের কাছে লোক গিয়েছিল। তিনি এলেন না। নিমতলিতেও কলেরা লেগেছে। সেখানেকার অবস্থা

ভয়াবহ। তবে সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে। সোহাগীতে এখনো কেউ আসে নি। কেউ বোধহয় নামও জানে না সোহাগীর।

পঞ্চম দিনে রহিমার ভেদবমি শুরু হল। আমিন ডাক্তার ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। করবার কিছু নেই। রুগীর পাশে বসে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কী-বা করা যায়?

শরিফা রহিমার মাথা কোলে নিয়ে বসে ছিল। নুরুদ্দিন অনুফার হাত ধরে বারান্দায় বসে ছিল। শরিফা ঢুকরে কেঁদে উঠল, একি সর্বনাশ ডাক্তার।

আল্লাহ্‌র নাম নেন, আল্লাহ্‌ নিকাবান।

রহিমার শরীর খুবই খারাপ হল মাঝরাত্রে। শরিফা ধরা গলায় বলল, কিছু খাইতে মন চায় ভইন?

নাহ্‌। ভইন, আমার উপরে রাগ রাইখ না।

না, আমার রাগ নাই। তোমরার সাথে আমি সুখেই আছিলাম।

শরিফা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। আমিন ডাক্তার উঠোনের চুলায় পানি সেদ্ধ কছিল। শরিফা বেরিয়ে এসে বলল, এরে নিখল সাব ডাক্তারের কাছে নিলে বালা হইয়া যাইত।

সময় নাই দোস্তাইন। সময়ের অনাটন।

রহিমা মারা গেল শেষত্রে। অনুফাকে দেখে মনে হল না সে খুব বিচলিত হয়েছে। আমিন ডাক্তার বলল, অনুফা বেটি, সিদ্ধ পানিদিয়া গোসল কর। সবজামাকাপড় পানির মইধ্যে সিদ্ধ করণ দরকার।

অনুফা কোনো আপত্তি করল না। আমিন ডাক্তার অনুফার মাথায় পানি ঢালতে লাগল। অনুফা ফিসফিস করে বলল, চাচাজী, নিখল সাব ডাক্তার আইতাছে।

কী কস তুই বেটি?

নিখল সাব ডাক্তার এই গেরামে আসছে।

সেই এক রাত্রে সোহাগীতে মারা গেল ছয় জন। গ্রামবন্ধন দেওয়ার জন্যে ফকির আনতে লোক গেছে। ফকির শুধু গ্রামবন্ধনই দেবে না, ওলাউঠাকে চালান। করে দেবে অন্য গ্রামে। অমাবস্যার রাত্রি ছাড়া তা সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে আগামীকাল অমাবস্যা।

ফকির সাব সকালে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার রিচার্ড এ্যালেন নিকলসন এসে পৌঁছলেন দুপুরবেলা। খবর পেয়ে আমিন ডাক্তার চৌধুরীবাড়ির ভাত ফেলে ছুটে এল।

ভালে আছ আমিন?

নিখল সাব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন। বিস্ময়ের চোটে আমিন ডাক্তারের মুখে। কথা ফুটল না। ডাক্তার নিখল সাব চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমরা নিমতলি গিয়েছিলাম।

সেখানে সরকারি সাহায্য এসেছে, কাজেই তোমাদের এখানে, আসলাম। আমাদের আরেকটা টীম গেছে সুশানপুকুর। তোমাদের অবস্থা কী?

স্যার, খুব খারাপ।

পানি ফুটিয়ে খাচ্ছে তোলোকজন? নিখল সাব হাসতে লাগলেন, যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

নিখল সাব এসে পৌঁছবার পর আর একটিমাত্র রুগী মারা গেল। কৈবর্তপাড়ার নিমু গোঁসাই। এত অল্প সময়ে ওলাউঠাকে আয়ত্ত করার কৃতিত্বের সিংহভাগ পেল ধনু ফকির। ফকির সাব ওলাউঠাকে পশ্চিম দিকে চালান করেছেন। সেই কারণেই শেষ রুগীটি হয়েছে পশ্চিমের কৈবর্তপাড়ায়।

নিখল সাব ডাক্তার শুক্রবার চলে গেলেন। যাবার সময় অনুফাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। অনুফা কোনো রকম আপত্তি করল না।

নিখল সাব ডাক্তার বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আমিন বলেছে তোমার মায়ের ইচ্ছে ছিল, তুমি আমার স্কুলে পড়। তুমি কি যেতে চাও?

অনুফা মাথা নাড়ল। সে যেতে চায়।

কাঁদবে না?

উঁহুঁ।

নাম কী তোমার?

অনুফা।

এত আস্তে বলছ কেন? আমাকে ভয় লাগছে?

উঁহুঁ।

নৌকা ছাড়ার ঠিক আগে আগে আমিন ডাক্তার চৌধুরীদের পাগল ছেলেটাকে ধরে এনে হাজির করল। যদি নিখল সাব কোনো চিকিৎসা করতে পারে। নিখল সাব। জিজ্ঞেস করলেন,কী নাম আপনার?

চৌধুরী জমির আলি। কী অসুবিধা আপনার?

জ্বি-না, কোনো অসুবিধা নাই।

রাত্রে ভালো ঘুম হয়?

জ্বি, হয়।

অত্যন্ত শান্ত ভদ্র কথাবার্তা। নিখল সাব ডাক্তার নৌকা ছেড়ে দিলেন। বড়ো গাঙের কাছাকাছি নৌকা আসতেই অনুফা বলল, নুরু ভাই খাড়াইয়া আছে ঐখানে।

নিখল সাব অবাক হয়ে দেখলেন, নুরুদ্দিন নামের শান্ত ছেলেটা সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর এল কী করে?

নৌকা ভেড়াব? কথা বলবে?

নাহ্‌।

যে-মেয়েটি সারাক্ষণের জন্য একবারও কাঁদে নি, সে এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

১৩. ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট

ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট।

নুরুদ্দিনের পেটে সারাক্ষণ ভাতের খিদে লেগে থাকে। শরিফা রোজই বলে, আজরফ টেকাপয়সা লইয়া আসুক, দুই বেলা ভাত রানমু।

কোন দিন আইব?

কবে যে আসবে, তা শরিফাও ভাবে। কোনোই খোঁজ নেই। নুরুদ্দিন গয়নার নৌকায় রোজ দু বেলা খোঁজ করে। মাঝে মাঝে চলে যায় লালচাচীর বাড়ি।

দুপুরে কী রানছ চাচী? ভাত?

না রে, জাউ। খাবি জাউ? দেই এক বাটি?

নাহ্। নুরুদ্দিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, রাইতে ভাত হইব নি চাচী?

দূর, ভাত আছে দেশটার মইধ্যে?

ভাত খাওয়নের ইচ্ছা হয় চাচী।

লালচাচী ঘোট নিশ্বাস ফেলে বলে, চাই চাউল ঘরে আছে। দিমু ফুটাইয়া?

আইচ্ছা দেও।

লালচাচী নুরুদ্দিনের কোলে বাচ্চা দিয়ে অল্প কিছু চাল বসায়। বাচ্চাটা অসম্ভব রুগ্ণ। ট্যা ট্যা করে কাদে। কিছুতেই তার কান্না সামলান যায় না। লালচাচী শান্ত স্বরে বলে, ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট রে নূরা।

হ।

নতুন ধান উঠলে এই কষ্ট মনে থাকত না।

নুরুদ্দিন খেতে বসে হাসিমুখে বলে, অনুফা তিন বেলা ভাত খায়। ঠিক না চাচী?

হুঁ।

ফালাইয়াছড়াইয়া খায়। ঠিক না চাচী?

হুঁ। নিখল সাবের তো আর পয়সার অভাব নাই।

বিকালের দিকে নুরুদ্দিন তার মাছ মারার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হয়। বাড়ির পেছনের মজা খালটাতে গোটা দশেক লার বড়শি পাতা আছে। বড়শি গুলির মাথায় জ্যান্ত লাটি মাছ। লাটি মাছের প্রাণ বড়ো শক্ত প্রাণ, এই অবস্থাতেও সে দশ-বার ঘন্টা বেঁচে থাকে। নুরুদ্দিনের কাজ হচ্ছে লাটি মাছগুলি মরে গেল কিনা, তাই দেখা। মরে গেলে সেগুলি বদলে দিতে হয়। মাছ কিন্তু ধরা পড়ে না। জংলা ভিটায় এই পরিশ্রম করলে রোজ দু-তিনটা মাছ ধরা পড়ত। নুরুদ্দিনের বড়ো ইচ্ছা করে জংলা ভিটায় যেতে–সাহসে কুলায়

না। একটা ফর্সা হাতের ছবি চোখে ভাসে। হাতভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। এত লাল চুড়ি হয় নাকি!

আমিন ডাক্তারের স্কুলে যাওয়াও নুরুদ্দিন বন্ধ করে দিয়েছে। সারা সকাল বসে বসে স্বরে অ স্বরে আ করে চেঁচাতে খুব খারাপ লাগে। এর চেয়ে সরকারবাড়ির জলমহালের কাছে ঘোরাঘুরি করলে কত কি দেখা যায়। জলমহাল এই বৎসর মাছে ভর্তি। পরপর তিন বৎসর পাইল করা হয়েছে। সাধারণত পানি বেশি হলে মাছ কমে যায়, এই বৎসর হয়েছে উল্টো। নরহরি দাস বলেছে এত মাছ সে কোনো জলমহালে দেখে নি। নুরুদ্দিন সারা সকাল জলমহালের পাশে বসে থাকে। সরকাররা মাছ ধরার খুব বড়ড়া আয়োজন করছেন এই বৎসর। তাদের ঘোট জামাই আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ছোট জামাই গান-বাজনায় খুব উৎসাহী। জামাই এলে নিশ্চয়ই কানা নিবারণকে আনা হবে। দু বছর আগে তিনি যাত্রাগান আনিয়েছিলেন, বৈকুণ্ঠের দল। পালার নাম মীনাকুমারী। তিন রাত যাত্রা হয়েছিল। সেই তিন রাত সোহাগীর কারো চোখে ঘুম ছিল না। ছোট জামাই আসার খবর হলে সোহাগীতে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। এই বার তেমন হচ্ছে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গানবাজনার কথা ভাবতে ভালো লাগে না।

আজরফ ফিরল আশ্বিন মাসে। শরিফার ধারণা আজরফ খালি হাতে আসে নি। বেশ কিছুটাকাপয়সা নিয়ে এসেছে। তার ধান বিক্রির টাকা আমিন ডাক্তারের কাছে। শরিফা চেয়েচিন্তে কিছু এনেছে। সেই টাকার প্রায় সবটাই রয়েছে, খরচ হয় নি। শরিফা ভেবেছিল, আজরফ আসামাত্র ধানটান কিনবে। খাওয়ার কষ্ট দূর হবে। আজরফ সেরকম কিছুই করছে না। অন্য সবার মতো ঘোরাঘুরি করছে জলমহালে। কাজ করবার জন্যে। এক দিন শরিফা বলেই ফেলল, টেকাপয়সা কিছু আনছস?

হুঁ।

কত টেহা?

আছে কিছু।

ধানটান কিছু কিনন দরকার। নুরা ভাত খাইত পারে না।

এই কয় দিন যখন গেছে, বাকি দিনও যাইব।

জমা টেহা তুই করবি কী?

জমি কিবাম। অভাবের লাগিন হস্তায় জমি বিক্রি হইতাছে।

আজরফ সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তাকে ভরসা করে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। কখন কী করবে বাড়িতে কিছুই বলে না। আমিন ডাক্তার এক দিন এসে বলল, আজরফ নৌকাড়া তো খুব বালা কিনছে, দোস্তাইন।

শরিফা আকাশ থেকে পড়েছে। নৌকা কেনার কথা সে কিছুই জানে না।

আজরফ, তুই নি নাও কিনছ?

হ।

কই, কিছু তো কস নাই।

কওনের কী আছে?

সরকারবাড়িতে আজরফ রোজ দুবেলা করে যাচ্ছে, যেন জলমহালের কাজের উপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। সরকারদের অনেক লোক দরকার। মাছ মোহনগঞ্জ নিয়ে পৌঁছান, নীলগঞ্জ নিয়ে যাওয়া, মাছ কাটা, মাছ শুকান-কাজের কি অন্ত আছে? কিন্তু কাজ পাওয়টাই হচ্ছে সমস্যা। নিজাম সরকার সোহাগীর লোকদের কাজ না দিয়ে অন্য গ্রামের লোকদের কাজ দিচ্ছেন। এর পেছনে তাঁর একটি নিজস্ব যুক্তি আছে। অন্য গ্রামের লোকদের কাজের সময় একটা কড়া কথা বললে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু নিজ গ্রামের লোকদের বেলা তা করা যাবে না। এদের সঙ্গে নিত্যদিন দেখা হবে। এরা যদি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখে সেটা খারাপ।

নিজাম সরকার অবশ্যি আজরফকে কাজ দিলেন। মাছের নৌকা নিয়ে নীলগঞ্জ যাওয়া।

রাইতে রওনা হইবা, সকালের ট্রেইনের আগে নিয়া পৌঁছাইবা। পারবা তো?

পারবাম।

তোমারে দেইখ্যা অবশ্যি মনে হয় পারবা। তোমার বাপের বদ স্বভাব তোমার। মইধ্যে নাই। তোমার বাপ আছে কই ওখন?

ঢাকা জিলায়। নরসিংদি।

বুঝলা আজরফ, গরুর যে গু, তারও একটা গুণ আছে। তোমার বাপের হেইডাও নাই।

আজরফের সঙ্গে সঙ্গে আমিন ডাক্তারেরও চাকরি হয়। হিসাবপত্র রাখা। হিসাব রাখার জন্য মোহনগঞ্জ থেকেও এক জনকে আনা হয়েছে। সেই লোক অতিরিক্ত চালাক। আমিন ডাক্তারকে চাকরি দেওয়ার সেটিও একটি কারণ। আমিন ডাক্তার এখন আর ডাক্তারী করে না। যদিও রুগী এখন প্রচুর। কিন্তু টাকাপয়সা কেউ দিতে পারে না। অষুধ পর্যন্ত বাকিতে কিনতে হয়। আমিন ডাক্তারের অষুধের বাক্সও খালি। অষুধ কিনে জমিয়ে রাখবে, সেই পয়সা কোথায়?

আমিন ডাক্তার এখনো খেতে যায় চৌধুরীবাড়ি। চৌধুরীবাড়ির খাওয়া আর আগের মত নেই। সকালবেলা রুটি হয়। রাতের বেলাতেই শুধু ভাত। বৌটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকে, বড়ো শরম লাগে এই সব খাওয়াইতে।

না মা না, শরমের কিছু নাই।

এবার অবস্থা আর আগের মতো নাই। জমি বিক্রি করতাছে।

কও কি মা! খাস জমি?

লেচু বাগানটা বেচছে, কিছু খাস জমিও যাইব।

কিনে কে? সরকাররা?

জ্বি না। মতি মিয়ার ছেলে আজরফ, সেই রকম শুনছি।

বড়োই অবাক হয় আমিন ডাক্তার। সেই রাত্রেই মতি মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হয়।

আজরফ জমি কিতাছস হুনলাম।

জ্বি চাচা।

কস কিরে বেটা।

সবটি টেকা একসাথে দিতাম পারতাম না। দুই বারে দিয়াম।

কত টেকা আছে তর, হেই আজরফ?

আজরফ যেন শরিফা শুনতে না পায় সে ভাবে নিচু স্বরে টাকার অঙ্কটা বলে। আমিন ডাক্তারের মুখ হাঁ হয়ে যায়।

দীর্ঘ দিন মতি মিয়ার কোনো খোঁজ নেই।

শরিফার কান্নাকাটিতে আমিন ডাক্তার নরসিংদির যাত্রাপার্টির অধিকারীকে একটি চিঠি দিয়েছে। দশ দিনের মধ্যে তার উত্তর এসে হাজির। কী সর্বনাশ! মতি মিয়া নাকি তিন শ টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে। আমিন ডাক্তার চিঠির কথা চেপে গেল। শরিফার সঙ্গে দেখা হলেই মুখ কালো করে বলে, চিডির উত্তর তো অখনো আইল না, বুঝলাম না বিষয়।

শম্ভুগঞ্জেও চিঠি লেখা হয়। সেখান থেকেও উত্তর আসে না। কাজকর্মে উজান দেশে যারা গিয়েছিল, সবাই ফিরে এসেছে। মতি মিয়ার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। শরিফা খুব চিন্তিত। আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। রাতে ভালো ঘুম হয় না। সংসারে কাজকর্মেও মন বসে না। তবু যন্ত্রের মতো সব কাজ করতে হয়। আজরফ ভর দিয়ে চলার জন্যে লাঠি বানিয়ে দিয়েছে। সেইটি বগলের নিচে দিয়ে সে ভালেই চলাফেরা করতে পারে। রহিমা মারা যাওয়ায় এখন সে কিছুটা নিঃসঙ্গ অনুভব করে। রাগারাগির জন্যেও হাতের কাছে এক জন কেউ দরকার। আজরফ এমন ছেলে, যাকে দশটা কথা বললে একটার উত্তর দেয়। তার বেশির ভাগ উত্তরই হাঁ- ই জাতীয়, আর নুরুদ্দিনের তো দেখাই পাওয়া যায় না। রাতের বেলাও সে মায়ের সঙ্গে ঘুমুতে আসে না। এক-একা বাংলা ঘরে শোয়। এইটুক ছেলের একা-একা শোয়ার দরকারটা কী? কিন্তু শরিফার কথা কে শুনবে?

নীলগঞ্জে শনিবারে হাট বসে। সেই হাটে মতি মিয়ার সঙ্গে নইম মাঝির হঠাৎ দেখা। নইম মাঝি বেশ কিছুক্ষণ চিনতেই পারে নি। হাত পা ফোলা-ফোলা। মাথার সেই কোঁকড়ান বাবড়ি চুল নেই। মুখভর্তি দাড়ি। খালি গায়ে একটা চায়ের স্টলের সামনে চুপচাপ বসে আছে।

কেডা, মতি ভাই না?

মতি মিয়া মুখ ঘুরিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, নইম বালা আছ?

ও মতি ভাই, তুমি এইখানে করডা কী?

চা খাইলাম। বালা চা বানায়।

শইলা খারাপ নাকি মতি ভাই? তুমি না শম্ভুগঞ্জে আছিলা?

যাত্রার চাকরিডা নাই।

কর কী তুমি অখন?

করি না কিছু। গান বান্দি।

বাড়িত যাই না? লও আমার সাথে, নাও লইয়া আইছি।

না।

অখন যাইতা না তোত কোন সময় যাইবা?

অখন এটু অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা, বাড়িতে বেহেই চিন্তা করতাছে।

মতি মিয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে থেমে থেমে বলল, একটা সাদি করছি নইম।

নইম মাঝির মুখে কথা সরে না। বলে কী মতি মিয়া!

কবে করলা?

মাস দুই হইল।

তাজ্জব করলা তুমি মতি ভাই।

মতি মিয়া ইতস্তত করে বলল, কেউরে হাইও না। তোমারে আল্লাহর দোহাই।

নইম মাঝি কাউকে বলল না, শুধু আজরফকে বলল।

পাঁচ কান করিম না আজরফ, নিজে গিয়া দেখ আগে। তর মারে হুনাইস না। মাইয়ামানুষ, বেহুদা চিল্লাইব।

আজরফের কোনো ভাবান্তর হয় না। যথানিয়মে কাজকর্ম করে। তারপর একদিন বাঁশ আর চাটাই দিয়ে রহিমার ঘর ঠিকঠাক করতে থাকে। শরিফার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি খুব রহস্যময় মনে হয়। হঠাৎ কাজকর্ম ফেলে ঘর-দুয়ার ঠিক করার দরকারটা কী? নুরুদ্দিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ঘর ঠিকঠাক করে যে, বিষয় কী?

আমি কী জানি?

তুই গিয়া জিগা।

তুমি জিগাও গিয়া, আমার ঠেকা নাই।

শরিফার নিশ্চিত ধারণা হয়, আজরফ সম্ভবত বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করতে চাওয়াটা দোষের কিছু নয়, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সময়-অসময় আছে। চাইলেই তো আর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না? দেশ জুড়ে আকাল। ঘরের মানুষটার কোন খোঁজ নেই। টাকাপয়সা অবশ্যি আছে। ভালোই আছে। ধানবেচা টাকা, উজান দেশ থেকে নিয়ে আসা টাকা। এদিকে সরকাররাও নিশ্চয়ই ভালো দিচ্ছে। গরুর মতো যে খাটে, তাকে দেবে না। কিন্তু টাকা থাকলেই বিয়ে করতে হবে? শরিফা বড়োই চিন্তিত বোধ করে। পরামর্শ করার লোক নেই। রহিমা থাকলে এই ঝামেলা হত না।

এক দিন নইম মাঝির বউ এসে বলল, আজরফরে দেহি চৌধুরীবাড়ির কোণায় কোণায় ঘুরে। এটু খিয়াল রাইখ্যো।

কথা সত্যি হলে খুবই ভয়ের কথা। চৌধুরীবাড়ির কোনো মেয়েকে মনে ধরলেও তা মুখ ফুটে বলা উচিত না। শরিফা কায়দা করে জানতে চায় ব্যাপারটা। আজরফকে ভাত বেড়ে দিয়ে হঠাৎ বলে বসে, চৌধুরীবাড়ির মাইয়ার লাখান মাইয়া পাইলে বৌ করতাম।

আজরফ নিরুত্তর।

হলদির লাখান শইলের রঙ।

আজরফকে দেখে মনে হয় না সে কিছু শুনছে।

চৌরীবাড়ির ছোড মাইয়ারে দেখছস নি আজরফ?

নাহ্।

শরিফার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয় তার। তারপর এক দিন যখন আজরফ হঠাৎ ঘঘাষণা করে, আগামীকাল ভোরে সে নুরুদ্দিনকে নিয়ে নীলগঞ্জে যাবে তার বাবাকে আনতে, তখন সন্দেহ ঘনীভূত হয়। হঠাৎ বাপের খোঁজ বের করে আনবার জন্যে যাওয়া কেন? আর নুরুদ্দিনের জন্যেইবা নতুন গেঞ্জি কেনা হল কেন? নতুন গেঞ্জির দরকারটা কী ছিল?

মতি মিয়ার বৌটির নাম পরী।

মেয়েটির বয়স খুবই কম, এবং বড়োই রোগ। কথা বলে উজান দেশের মানুষদের মতো টেনে টেনে। নুরুদ্দিন খুব অবাক হল। সে ভাবতেও পারে নি, এ রকম আশ্চর্য একটি ব্যাপার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরী নুরুদ্দিনের হাত ধরে তাকে পাশে বৎসল এবং টেনে টেনে বলল, ছোড মিয়ার গালে একটা লাল তিল, দেখছ নি কাণ্ড।

গালের লাল তিল যে একটি চোখে পড়ার জিনিস নুরুদ্দিন তা স্বপ্নেও ভাবে নি। তার লজ্জা করতে লাগল।

চা খাইবা ছোড মিয়া? চা বানাই? নতুন খেজুর গুড়ের চা।

নুরুদ্দিনের মতো বাচ্চা ছেলেকে চা খাওয়াবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করে? তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে লজ্জিত মুখে চোখ ঘুরিয়ে ঘরবাড়ি দেখতে লাগল। দেখার মত কিছু

নেই। ছোট্ট এক চিলতে ঘর, এক প্রান্তে দড়ির একটি খাটিয়ায় কাঁথা-বালিশ। ঘরের অন্য প্রান্তে একটি হারমোনিয়ামের উপর এক জোড়া ঘুঙুর। চা বানাতে বানাতে পরী বলল, নাচনিওয়ালী ছিলাম, বুঝছ নি ছোট মিয়া–হইলাম ঘরওয়ালী।

মতি মিয়া ধমক দিল, আহ্, কী কও?

ক্যান, তোমার সরম লাগে?

পুরান কথার দরকার কী?

পরী খিলখিল করে হাসতে লাগল।

ফেরবার পথে মতি মিয়া গম্ভীর হয়ে রইল। তাকে বড়োই চিন্তিত মনে হল। কিন্তু পরীর ভাবভঙ্গি খুব স্বাভাবিক। নৌকার অন্য প্রান্তে নুরুদ্দিনের সঙ্গে সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে, ঐটা কোন গ্রাম? ঘাসপোতা? ঘাসপোতা আবার কেমুন নাম?

ভাটি অঞ্চলে পানি কোন সময় হয়? তোমরার জংলা-বাড়ির ভিটাতে তুমি নাকি একটা পেততুনী দেখছিলা? হাতে লাল চুড়ি? কথাডা সত্য?

চৌধুরীবাড়ির একটা পুলার নাকি মাথা খারাপ?

কে ধনী বেশি? চৌধুরীরা না সরকাররা?

মতি মিয়া তেমন কোনো কথাবার্তা বলল না। বড় গাঙ থেকে ছোট গাঙে নৌকা ঢেকবার সময় শুধু বলল, জমির কাজ-কাম শুরু করণ দরকার।

আজরফ বলল, আপনে আর যাইতেন না শম্ভুগঞ্জ?

দূর, গান-বাজনা ছাড়ান দিছি। পোষায় না।

আজরফ কিছু বলল না। মতি মিয়া নিজের মনেই বলল, ঘর-সংসার দেখুন দরকার। গান-বাজনায় কি পেট ভরে? ভাত কাপড় আগে, বুঝছ?

নৌকা সোহাগীর কাছাকাছি আসতেই মতি মিয়া উসস করতে লাগল।

আমরা যে আসছি, তরমায় জানে?

নাহ্।

কিছুই কস নাই?

নাহ্।

মাবুদে এলাহী, বড়ো চিন্তার কথা আজরফ। কামডা ঠিক হইল না। আমি ভাবছি, তর মা বোধহয় নেওনের লাগি পাঠাইছে।

মতি মিয়া গভীর হয়ে তামাক টানতে লাগল। নৌকা ঘাটে আসামাত্র। আজরফকে বলল, আমিন ডাক্তারের সাথে একটা জরুরী কথা আছিল। কথাডা সাইরা আইতাছি, তরা বাড়িত যা।

আজরফের কিছু বলার আগেই মতি মিয়া সরকারবাড়ির আমবাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শরিফার স্তম্ভিত ভাব কেটে যেতেই সে চেঁচাতে শুরু করল। সন্ধ্যাবেলাটা কাজকর্মের সময়, তবু তার চিৎকারে ভিড় জমে গেল। এমন ব্যাপার সোহাগীতে বহু দিন হয় নি। মতি মিয়া কোত্থেকে এক মেয়ে নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই মাগীর লজ্জা-শরম কিছু নেই, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে নির্বিকার। যেন কিছুই হয় নি। শরিফার চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে ভরসন্ধ্যায় ঘাটে গা ধুতে গেল। হারিকেন হাতে তার পিছু পিছু গেল নুরুদ্দিন। গাঙের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বলল, আমারে না। দেখলে চিল্লানিটা কিছু কমব, কী কও নুরুদ্দিন?

চিৎকার অবশ্যি কমল না। পরী ফিরে এসে দেখে শরিফা নিজের মাথার চুল ছিড়ছে। নইম মাঝির বউ তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

পরী বলল, এখন চিল্লাইয়া তো কোনো লাভ নাই। চিল্লাইলে কী হইব কন আপনে? আমি এইখানেই থাকবাম। আমার যাওনের জায়গা নাই।

শরিফা পরপর দু দিন না খেয়ে থাকল। খুনখুন করে কাঁদল পাঁচ দিন, তারপর জ্বরে পড়ে গেল। এই সময় পরী সম্পর্কে তার ধারণা হল, মেয়েটি খারাপ নয়। মতি মিয়ার মতো একটি অপদার্থের হাতে কেন পড়ল, কে জানে।

নুরুদ্দিনকে এখন আর লালচাচীর কাছে ভাত খেতে যেতে হয় না। পরী শুধুমাত্র নরুদ্দিনের জন্যেই ভাতের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্যি লালচাচী কিছুদিন হল বাচ্চা রেখে চলে গিয়েছে বাপের বাড়ি। সিরাজ মিয়া আরেকটি বিয়ে করেছে। এই বৌটি বোকাসোকা। বড়ো আদর করে লালচাচীর ছেলেকে। ছেলেটি তবুও রাত-দিন ট্যাট্যা করে। এই বৌনুরুদ্দিনকে খুব আদর করে। নুরুদ্দিনকে দেখলেই বলে, লাড়ু খাইবা? তিলের লাড়ু আছে।

নুরুদ্দিন না বললেও সে এনে দেবে। কাজকর্মে সে লালচাচীর চেয়েও আনাড়ি। এই বৌটিকেও নুরুদ্দিনের খুব ভালো লাগে।

১৪. সরকারবাড়ির জলমহালে

সরকারবাড়ির জলমহালে মাছ মারবার জন্য এক দিন সকালে একদল কৈবর্ত এসে হাজির। সর্বমোট সাতটি নৌকার বিরাট একটা বহর। স্থানীয় কৈবর্ত ধারণাও করতে পারে নি, বাইরের জেলেদের মাছ-মারার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় কৈবর্তদের প্রধান নরহরি দাস ছুটে এল। নিজাম সরকার গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরার কাছে মাছ ধরার বড় জালই নাই। তোমরা মহালের মাছ ধরবা কী দিয়া?

এইডা কী কথা কইলেন সরকার সাব! মাছ ধরাই আমরার কাম, আর জাল থাকত না? আসল কথাডা কী চৌধুরী সাব?

আসল কথা নকল কথা কিছু নাই, নরহরি। নিজ গোরামের লোক দিয়া আমি কাম করাইতাম না।

আমরা দোষটা কী করলাম? সারা বচ্ছ জলমহালের দেখশোন করলাম। এখন পুলাপান লইয়া কই যাই?

নরহরি দাস হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিদেশী কৈবর্ত-দলটি রাতারাতি জলমহালের পার্শ্বে ঘরবাড়ি তুলে ফেলল। গাবের কষে জাল ভিজিয়ে প্রকাণ্ড সব জাল রোদে শুকাতে লাগল। ওদের মেয়েরা উদোম গায়ে শিশুদের দুধ খাওয়াতে-খাওয়াতে এমন ভাবে হাঁটাচলা করতে লাগল, যেন এই জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে আছে। রাতারাতি নতুন বসতি তৈরী হল। হাঁস-মুরগি চরছে। গরু দোয়ান

হচ্ছে। সন্ধ্যার পর খোলা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে গান-বাজনার আয়োজনও হল। ঢোল বাজতে লাগল মধ্যরাত পর্যন্ত।

নরহরি দাস তাদের সঙ্গে আলাপ করে সুবিধা করতে পারল না। সরকারবাড়ির সঙ্গে নরহরির কী কথা হয়েছিল, তা তারা জানতে চায় না। তাদের চার মাসের করে আনা হয়েছে। মাছের ত্রিশ ভাগ নিয়ে মাছ ধরে দেবে, এইটিই একমাত্র কথা। নরহরির যদি কিছু বলবার থাকে, তাহলে তা সরকারবাড়ির সঙ্গেই হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে নয়।

মঙ্গলবার সকালবেলা কৈবর্তদের কুমারী মেয়েরা এলোচুলে জলমহালে নেমে পূজা দিল। পূজার ফলস্বরূপ অসম্ভব মাছ ধরা পড়বে, মাছ মারার কোনো রকম বিঘ্ন উপস্থিত হবে না। প্রথম যে-মাছটি ধরা পড়ল সেটি একটি দৈত্যাকৃতি কাতল। ডালায় সিঁদুর, ফুল এবং কাতলটি সাজিয়ে পাঠান হল সরকারবাড়ি। ঘনঘন উলু পড়তে লাগল নতুন কৈবর্তপাড়ায়।

মাছ মারা হয়েছে পুরোদমে। মাছখোলার পাশে একটি চালাঘর তোলা হয়েছে। আমিন ডাক্তার সেখানে খাতা-পেন্সিল নিয়ে সারা দিন বসে থাকে। কৈবর্তরা চিৎকার করে হিসাব মেলায়,

এক কুড়ি–এক
দুই কুড়ি-দুই।
তিন কুড়ি-নি
রাখ তিন। রাখ তিন। রাখ তিন।
চার কুড়ি–চার।
পাঁচ কুড়ি–পাঁচ

ছয় কুড়ি–ছয়।

রাখ ছয়। রাখ ছয়। রাখ ছয়।

আমিন ডাক্তারের ব্যস্ততার সীমা নেই। কত মাছ ধরা পড়ল, কত গেল, আর কত মাছ পাঠান হল খোলায়–সহজ হিসাব নয়। নাওয়াখাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই।

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা চৌধুরীবাড়ির মতো নয়। খাবার দেওয়া হয় বাংলাঘরে। একটি কামলা এসে ভাত দিয়ে যায়। মোটা চালের ভাত আর খেসারির ডাল। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করে না। এই ব্যবস্থা আমিন ডাক্তারের ভালো লাগে। মেয়েরা কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখছে জানলে তৃপ্তি করে খাওয়া যায় না। এখানে সে-ঝামেলা নেই। নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া, তবু প্রতি বারেই খেতে বসার সময় চৌধুরীবাড়ির কথা মনে পড়ে।

শেষ দিন যখন খেতে গেল তখন খুব ভালো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। মাঝখানে চৌধুরী সাহেব এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন।

শেষ কয়টা দিন তোমার কষ্ট হইল ডাক্তার, সময়টা আমার খারাপ পড়ছে, কী আর করবা কওঁ।

না-না চৌধুরী সাব, কী কন আপনি?

কোনো দিন চিন্তাও করছি না, আমার বাড়ির অতিথ চাইর পদের নিচে খানা খাইব।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ থেকেই চলে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার শেষে বৌটি। যথারীতি মিষ্টি গলায় বলল, পেট ভরছে ডাক্তার চাচা?

আমিন ডাক্তারের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরাগলায় বলল, খুব খাইছি, মা।

বসেন, পান আনতে গেছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অনেক ভদ্রলোক দেখছি মা এই জীবনে, কিন্তু চৌধুরীর মতো ভদ্রলোক দেখলাম না।

বৌটি অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। আমিন ডাক্তার যখন চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, শান্ত গলায় বলল, ডাক্তার চাচা, আমার বিয়ার সময় এরা কিন্তু কয় নাই– ছেলেটা পাগল। ছয় বৎসর বিয়া হইছে, কিন্তু আমারে বাপের বাড়িত যাইতে দেয় না। আমার বাপ-চাচা গরিব মানুষ, তারা কী করব কন?

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বৌটি মনে হল কাঁদছে। আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, মা আমি খাস মনে দোওয়া করছি, ছেলেটা বালা হইয়া যাইব। মাথার দোষ থাকত না। তুমি দেখবা, নিজেই দেখবা।

ঘর থেকে বেরুবার পরপরই পাগল ছেলেটা চেঁচাতে লাগল, এই শালা আমিন চোরা, তরে আইজ খুন কইরা ফাঁসি যাইয়াম। শালা তর এক দিন কি আমার এক দিন।

আমিন ডাক্তার জলমহালে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে আজরফ বসে আছে।

কী রে আজরফ–কোনো খবর আছে?

জ্বিনা চাচা। বাজান আবার গেছে গিয়া।

কস কী? কই গেছে?

জানি না।

আজরফ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমিন ডাক্তার দেখল, আজরফের চোখ ভেজা।

বিষয় কি আজরফ, কী হইছে?

জমি কিনার লাগিন যে টেকাপয়সা আছিল, বাজান সব লইয়া গেছে। পাতিলের মইধ্যে আছিল।

কান্দিস না, আজরফ। বেড়া মাইনষের কান্দন ঠিক না, উখ মোছ।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল।

১৫. নুরুদ্দিনের লার বড়শি

নুরুদ্দিনের লার বড়শিতে প্রকাণ্ড একটি রুই মাছ ধরা পড়েছে। লার বড়শিগুলিতে বোয়াল মাছ ছাড়া অন্য কিছু ধরা পড়ে না। এই রুই মাছটার মরণদশা হয়েছিল। খালের পাশে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুনে পরী এগিয়ে গিয়ে দেখে এই কাণ্ড। দু জনে মিলে মাছ টেনে তুলতে পারে না। আর বড়শির টুইন সূতা ছিঁড়ে যাচ্ছে না কেন, সেও এক রহস্য। হৈ-চৈ শুনে শরিফা বেরিয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, মাছ। কই পাইছ, এই নুরা?

নুরুদ্দিন হাঁপাচ্ছে, কথা বলার শক্তি নেই।

এই ছেরা, মাছ কই পাইছ?

বড়শি দিয়া ধরলাম।

এই মাছ তুই বড়শি দিয়া ধরছস? কী কস তুই।

নুরুদ্দিন জবাব দিল না।

পরী হাসিমুখে বলল, আইজ খুব বালা খানা করবাম। আজরফরে কইয়াম চাই পুলাউয়ের চাউল আনত। কী কস নুরা?

নুরুদ্দিন সব কয়টি দাঁত বের করে হাসে। শরিফা গলা উচিয়ে ডাকে, আজরফ, ও আজরফ, উইঠা আয়।

আজরফ সারারাত নৌকা চালিয়ে মাছ নিয়ে যায় নীলগঞ্জে। দিনের বেলা পড়ে। পড়ে ঘুমায়। ডাকাডাকি শুনে সে বাইরে এসে অবাক, অত বড় মাছ কই পাইছস নুরা!

লার বড়শি দিয়া ধরছি।

কস কী নুরুদ্দিন।

পরী হাসতে-হাসতে বলল, মাছটার কপালে মিত্যু লিখা ছিল, বুঝছ আজরফ? অখন যাও, কিছু বালা-মন্দ রান্ধনের যোগাড় কর। চাইপডা পোলাওয়ের চাউল আনতা পাবা?

আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, মাছটা নীলগঞ্জে লইয়া যাইয়াম। পনর টেহা দাম হইবে মাছটার। নুরুদ্দিন ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, এই মাছ আমি বেচতাম না ভাইসাব।

আমরা অত বড় মাছ দিয়া কী করবাম? বেকুবের মতো কথা কম। ঘরে একটা পয়সা নাই।

কানকোয় দড়ি বেঁধে আজরফ মাছ গাঙের পানিতে ছেড়ে রাখল। নৌকা ছাড়বে আছরের ওয়াক্তে। যতক্ষণ পারা যায় মাছ জিইয়ে রাখা। নূরুদ্দিন কোনো কথা বলল না। আজরফ আবার যখন কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাবার আয়োজন করছে, তখন নুরুদ্দিন চাপা স্বরে বলল, ভাইসাব, মাছ আমি বেচতাম না।

আজরফ বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, এক চড় দিয়া দাঁত ফালাইয়া দিয়াম, এক কথা এক শ বার কস।

আজরফ আছরের আগে আগে মাছ আনতে গিয়ে দেখে খুঁটিতে বাঁধা মাছ নেই। নুরুদ্দিনেরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যাপারটিতে পরীর হাত আছে, বোঝই যাচ্ছে। আজরফ লক্ষ করল, পরী মুখ টিপে হাসছে। আজরফ নীলগঞ্জে যাবার জন্যে যখন তৈরী হচ্ছে, তখন পরী বলল, কয়েকটা টেকা রাইখ্যা যাও আজরফ, পুলাপান মাইনষের সখ। গোসা হইও না।

আজরফ কথার উত্তর না দিয়েই বের হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল, বালিশের উপর পাঁচ টাকার একটা নোট।

আমিন ডাক্তার দীর্ঘদিন পর আজ ডাক্তারী করে এল। রুগী নয়া কৈবর্তপাড়ার। উত্থানশক্তি নেই এক বুড়ি। দু দিন ধরে প্রবল জ্বর। খাওয়াদাওয়া বন্ধ। আমিন ডাক্তার গিয়ে দেখে বুড়ির যত্নের সীমা নেই। গোটা কৈবর্তপাড়াই বুড়িকে ঘিরে আছে। এক জন পায়ের পাতায় প্রাণপণে তেল মালিশ করছে, অন্য এক জন তালপাখা নিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া করছে। আমিন ডাক্তার প্রচণ্ড ধমক দিল পাখাওয়ালা ছেলেটিকে।

নিউমোনিয়া বানাইতে চাস নাকি, অ্যাঁ?

আমিন ডাক্তার তার ব্যাগ খুলে লাল রঙের দুটি বড়ি পানিতে গুলে খাইয়ে দিল। অষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, বুড়ি চোখ মেলল দেখতে দেখতে।

কেডা গো?

এইডা আমিন ডাক্তার, এই দিগরে ইনার মত ডাক্তার নাই।

বুড়ি ক্ষীণ স্বরে বলল, ডাক্তার সাবের শইলডা বালা?

অষুধের দাম বাবদ এক টাকা ছাড়াও আর পাঁচটা টাকা তারা রাখল আমিন ডাক্তারের সামনে। আমিন ডাক্তার অবাক।

এক টাকা ভিজিট আমার।

ডাক্তার সাব, রুগীর নিজের টাকা। সে আপনেরে দিতে চায়। কইল, সকালে আরেক বার আইস্যা দেখন লাগব।

না কইলেও আসবাম। রুগীর একটা বিহিত না হইলে কি আর ডাক্তারের ছুটি আছে? ডাক্তারী সোজা জিনিস?

হৃষ্টচিত্তে বাড়ির পথ ধরল আমিন। পিছে পিছে এক জন এল হারিকেন নিয়ে। যার যা কাজ সেটা না করলে কি আর ভালো লাগে? না, ডাক্তারীটা আবার শুরু করতে হয়। অষুধপত্র কেনার জন্যে মোহনগঞ্জ যেতে হবে এবার। নিখল সাবকে একটা চিঠি দিলে কেমন হয়? ডাক্তারের সাথে ডাক্তারের যোগ তো থাকাই লাগে। অনুফার একটা খোঁজও নেওয়া দরকার। কেমন আছে মেয়েটা কে জানে?

আমিন ডাক্তারের বাড়ির উঠোনে গুটিটি মেরে কে যেন বসে আছে। জায়গাটা ঘুঘুটে অন্ধকার।

কে এইখানে?

আমিন চাচা, আমি।

তুই অত রাইতে কী করস?

নুরুদ্দিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্দস ক্যান? কী হইছে?

আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

কী রাইখ্যা দিছে?

মাছ।

আমিন ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারল না। হারিকেনের আলোয় দেখল, নুরুর সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। ডান গাল ডালিমের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

এই নুরা, কী হইছে? আমার মাছটা রাইখ্যা দিছে।

আয়, ভিতরে আইয়াক দেহি কী হইছে। কান্দিস না।

ঘটনাটি এ রকম। নুরুদ্দিন তার রুই মাছ নিয়ে দক্ষিণ কান্দায় উঠতেই নিজাম সরকার তাকে দেখতে পান। নিজাম সরকারের ধারণা হয়, মাছটা গতরাত্রে মাছখোলা থেকে চুরি করা। এত বড় একটা মাছ (তাও রুই মাছ) লার বড়শিতে ধরা পড়েছে, এটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার উপর নুরুদ্দিন সারাক্ষণই জলমহালের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে।

নিজাম সরকার নুরুদ্দিনকে ধরে নিয়ে যান মাছখোলায়। মাছ চুরিতে কারা কারা আছে তা জানবার জন্যে মাত্রার বাইরে মারধোর করা হয়। মারের জন্যে নুরুদ্দিনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাছটি ফেরত পাবার আশাতেই সে বিকাল থেকে আমিন ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমিন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলল, যা, বাড়িত যা, আমি সরকারবাড়িত যাইতাছি।

মাছটা তারা দিব আমিন চাচা?

নিশ্চয়। না দিয়া উপায় আছে? কান্দিস না। বাড়িত যা।

এইখানে বইয়া থাকি চাচা, আপনে মাছটা লইয়া আইয়েন।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের কথা শুনে বিরক্ত হলেন। এ কি ঝামেলা! তামাক টানা বন্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, চোরের যে সাক্ষী, হেও চোর– এইডা জান ডাক্তার?

সরকার সাব, নুরু চুরি করে নাই।

চুরি করছে না, তুমি নিজে দেখছ?

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, সরকার সাব, চুরি যে নুরু করছে, হেইডাও তো আপনে দেখেন নাই।

নিজাম সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কড়া গলায় বললেন, বাড়িত যাও ডাক্তার।

সরকার সাব একটা বড়ো অন্যায় হইছে। অন্যায়কার বিহিত হওন দরকার।

তুমি বড়া ঝামেলা করতাছ। যাও, বাড়িত গিয়া ঘুমাও। সকালে আইবা, তোমার সাথে কথা আছে।

আমিন ডাক্তার থেমে থেমে বলল, অন্যায়ের বিহিত না হওন পর্যন্ত আমি যাইতাম না।

কী করবা তুমি?

আপনের বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মইধ্যে বইয়া থাকতাম।

যাও, থাক গিয়া।

নিজাম সরকার আমিন ডাক্তারের স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। ছোটলোকেরা বড়ো বেশি আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে এই সব বন্ধ করতে হবে। এশার নামাজের পর উঠোনে এসে দেখেন আমিন ডাক্তার সত্যি সত্যি বাড়ির সামনের ক্ষেতটার মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে। চৌধুরীদের পাগলা ছেলেটাও আছে সেখানে; চেঁচাচ্ছে, চোরের গুষ্টি বিনাশ করণ

দরকার। চোরের গুটি বিনাশ করণ খুব বেশি দরকার। চৌধুরীবাড়ির কামলারা এসে পাগলাটাকে ধরে নিয়ে গেল।

নইম মাঝির বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত টোয়েন্টি-নাইন খেলা হয়। নইম মাঝি মাঝরাত্রে খেলা ফেলে দেখতে গেল, আমিন ডাক্তারের ব্যাপারটা কত দূর সত্যি। হ্যাঁ, আমিন ডাক্তার বসে আছে ঠিকই। তার গায়ে লাল রঙের কোট। কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলেই মাথার উপর ছাতি মেলা হয়েছে।

সত্যি সত্যি বাড়িত যাইতা না ডাক্তার ভাই?

নাহ।

জার পড়ছে খুব। বিড়ি খাইবা? চান বিড়ি আছে।

দেও দেখি।

বিড়ি ধরিয়ে নইম মাঝি শান্ত স্বরে বলল, ডাক্তার ভাই, বাড়িত গিয়া ঘুমাও। শীতের মইধ্যে বইয়া থাইক্যা লাভটা কী, কও?

আমিন ডাক্তার কিছু বলল না।

হঠাৎ বিড়ির লালাভ আগুনে নইম মাঝি লক্ষ করল, আমিন ডাক্তার কাঁদছে। সে বড়ই অবাক হল। নইম মাঝি সেই রাত্রে আর বাড়ি ফিরল না। নয়া কৈবর্তপাড়ায় প্রতি রাতেই ঢোল বাজিয়ে গান-বাজনা হয়। আজ আর হল না।

১৬. নিজাম সরকার কল্পনাও করেন নি

নিজাম সরকার কল্পনাও করেন নি ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। একটা আধাপাগলা লোক বাড়ির সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকলে, কার কী যায় আসে?

কিন্তু নিজাম সরকার ফজরের নামাজ শেষ করে বারান্দায় এসে দেখেন, আমবাগানে দশ-বার জন লোক জটলা পাকাচ্ছে। আমিন ডাক্তারের গা ঘেঁষে বসে আছে নইম মাঝি। নইম মাঝি নিজাম সরকারকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্লামালিকুম সরকার সাব।

নিজাম সরকার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। নামাজের পর তিনি উঠোনে বসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শরিফ পড়েন। আজ পড়তে পারলেন না। হনহন। করে এগিয়ে গেলেন আমিন ডাক্তারের দিকে।

নইম মাঝি সরকার সাহেবকে দেখে দাঁড়াল, কিন্তু আমিন ডাক্তার বসে রইল। বহু কষ্টে রাগ সামলালেন নিজাম সরকার। থমথমে গলায় বললেন, তুমি এইখানে কী কর নইম? বেহুদা ঝামেলা করছ নোমরা। আমি থানাত খবব দিয়াম। যাও, বাড়িত যাও।

আইচ্ছা।

নইম মাঝি কিন্তু বাড়ি গেল না। আমিন ডাক্তারের পাশে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

জলমহালে গিয়ে সরকার সাহেবের মাথায় রক্ত উঠে গেল। মাছ মারার কোনো আয়োজন নেই। জেলেরা ছেলেমেয়ে নিয়ে রোদ পাচ্ছে।

এই, বিষয় কী? আইজ কাজকাম নাই?

কৈবর্তদের মুরব্বি ধীরেন্দ্র হাত জোড় করে এগিয়ে এল।

এই ধীরেন, কী হইছে?

আমরারে কইছে, আইজ মাছ মারা হইত না।

কে কইছে?

ধীরেন্দ্র নিরুত্তর।

বল কে কইছে।

হাশেম সাব কইছেন।

হাশেম সাব! ডাক তো হাশেম সাবরে। দেখি বিষয় কী?

হাশেম সাব আমিন ডাক্তারের সঙ্গে মাছের হিসাব রাখে। লোকটি মহা ধুরন্ধর। এসেই অবাক হয়ে বলল আমি আবার কোন সময় কইলাম। ফাইজামির জায়গা পাও না? যত ছোটলোকের দল। যাও, কামে যাও।

কার্তিক মাসের শেষাশেষি জমি তৈরীর কাজে সবার ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু সোহাগীর লোকজন সেদিন কেউ কাজে গেল না। সরকারবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। দুপুরবেলা এলেন চৌধুরী সাহেব।

গম্ভীর হয়ে বললেন, ঝামেলাটা মিটাইয়া ফেল নিজাম। লোকটা না খাইয়া আছে।

কী করতে কন আমারে?

মহাল থাইক্যা একটা বড় মাছ ধইরা মতি মিয়ার বাড়িত পাঠাইয়া দেও। একটা মাছে তোমার কিছু যাইত-আইত না।

চৌধুরী শাব, নরম হইলে গাঁও-গেরামে থাকন যায় না। আইজ একটা মাছ দিলে, কাইল দেওন লাগব দশটা।

লোকটা না খাইয়া থাকব?

আমি কি কইম তার? আমি কি তারে কইছি না খাইয়া থাকতে?

চৌধুরী সাহেব গেলেন আমিন ডাক্তারের কাছে। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ডাক্তার আইও আমার সাথে, চাইরডা ডাইল-ভাত খাও। আও দেখি আমার সাথে।

একটা মীমাংসা না হইলে কেমনে খাই চৌধুরী সাব?

কয় দিন থাকবা এই বায়? ধর যদি মীমাংসা না হয়?

যত দিন না হয় তত দিন থাকবাম।

বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। কার্তিক মাসে এরকম বৃষ্টি হয় না কখনো। ছাতা মাথায় দিয়ে আমিন ডাক্তার উবু হয়ে বসে-বসে ভিজতে লাগল। নিজাম সরকারের বিরক্তির সীমা রইল না। রাতের বেলা তাঁর জামাই আসার কথা, সে এসে যদি দেখে এমন একটা অবস্থা–সেটা মোটেই ভালো হবে না। অবশ্যি মোহনগঞ্জ থানায় খবর পাঠান হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে থানাওয়ালাদের আসবার কথা। এলে ঝামেলাটা চোকে। নিজাম সরকার তামাক টানতে লাগলেন।

সন্ধ্যার আগে আগে ধীরেন্দ্র এসে হাজির। সে নাকি কী বলতে চায়। নিজাম সরকার গম্ভীর মুখে বললেন, কী কইতে চাও?

ধীরেন্দ্র হাত কচলাতে লাগল। সে একটি বিশেষ কথা বলতে এসেছে। চুক্তি অনুযায়ী যে ত্রিশ ভাগ মাছ ওদের প্রাপ্য, সেখানে থেকে সে পাঁচটা বড়ো বড়ো মাছ মতি মিয়ার কাছে পাঠাতে চায়। নিজাম সরকার গলা ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাছ দিতে চাও?

আজ্ঞে চাই।

ক্যান? কারণটা আমারে কও।

কোনো কারণ নাই, ঝামেলাটা মিটাইতে চাই।

ঝামেলা কী? আর ঝামেলা থাকেই, তুমি সেইটা মিটাইবার কে? তুমি কোন মাতবর?

ধীরেন্দ্র তবু যায় না। উসখুস করে।

যাও এখন তুমি বিদাও হও।

সন্ধ্যাবেলা বহু লোকজন আবার সামনে এসে জড়ো হল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। পশ্চিম আকাশে অল্প অল্প আলো থাকায় অস্পষ্টভাবে সব কিছু নজরে আসে। থানাওয়ালাদের এসে পড়া উচিত, কেন এখনো আসছে না কে জানে? জামাই রাত নটার মধ্যে এসে পড়বে। কী কুৎসিত ঝামেলা!

নিজাম সরকার হঠাৎ করে ঠিক করলেন, আমিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন। আর ঠিক তখনি মাছের খোনার একটি দিক আলো হয়ে উঠল। প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা যেতে লাগল। নিজাম সরকার দোনলা বন্দুক হাতে নিচে নেমে এসে শুনলেন, স্থানীয় কৈবর্তরা লাঠি-সড়কি নিয়ে মাছের খোলায় চড়াও হয়েছে। খুব কম হলেও দু জনের পেটে সড়কি বিধেছে।

রাত বারটায় মোহনগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার এসে আমিন ডাক্তার, নিমাই মাঝি এবং আবু খাঁকে বেঁধে নিয়ে গেল। কৈবর্তপাড়ায় কোন পুরুষমানুষ, পাওয়া গেল না। সব পুরুষ রাতারাতি উধাও হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে আমিন ডাক্তারকে নৌকায় ভোলা হল। ঘাটে কোন জনমানব ছিল না।

ময়মনসিংহের সেসন জজ দুটি খুন এবং দাঙ্গাহাঙ্গামায় নেতৃত্ব দানের অভিযোগে আমিন ডাক্তার এবং নিমাই মাঝিকে দীর্ঘদিনের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দিলেন।

সোহাগীর দিন কাটতে লাগল আগের মতোই। ঘুরেফিরে আবার বৈশাখ মাস এল। বাঘাই সিনির গান গেয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেঁচাতে লাগল–

আইলাম গো যাইলাম গো
বাঘাই সিনি চাইলাম গো।

আজরফ বিয়ে করল সুখানপুকুরে। জমিজমা করল। চৌধুরীদের আমবাগান কিনল।

ডাক্তার ফজলুল করিম সুখানপুকুরে এসে আবার শেখ ফার্মেসি খুললেন। আবার চলেও গেলেন।

সোহাগীতে প্রাইমারি স্কুল হল। ছাত্রের অভাবে সেই স্কুল চলল না।

সিরাজ মিয়া আবার আরেকটি বিয়ে করল। সে-বউ আবার কয়েক দিন পর মরেও গেল। সিরাজ মিয়ার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। জমিজমা বিক্রি হতে লাগল। দিন কাটতে লাগল সোহাগীর। তারপর এক সময় আমিন ডাক্তারের কথা কারো মনেই রইল না। এগার বৎসর বড়ো দীর্ঘ সময়।

১৭. আবার কতকাল পরে ফেরা

আবার কতকাল পরে ফেরা।

সব কিছু কেমন অচেনা লাগে। কিছুই যেন আগের মতো নেই। নতুন নতুন রাস্তাঘাট নতুন নতুন বাড়িঘর। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে আমিন ডাক্তারের চোখ ভিজে উঠল। কত পুরনো জায়গা, অথচ কত অচেনা লাগছে।

মোহনগঞ্জ থেকে এখন লঞ্চ যায় নিমতলি, সুখানপুকুর, ঘাসপোতা। গয়নার নৌকা নাকি উঠেই গেছে। লঞ্চে চেপে হুসহস করে লোকজন চলাফেরা করে। আমিন ডাক্তার লঞ্চের ছাদে চাদর পেতে বসে থাকে চুপচাপ। এই লঞ্চে করেই হয়তো কেউ কেউ যাচ্ছে নিমতলি আর সোহাগীতে, অথচ কাউকেউ চিনতে পারছে না।

গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছে। আমিন ডাক্তার তৃষিতের মতো তাকিয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে নদী ভরে গিয়েছে। ছেলেরা ঝাঁঝাঁপি করছে নতুন পানিতে। ঐ একটি নাইওরিদের নৌকা গেল। বৌটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে। আমিন ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়ে। বয়স হয়ে মন অশক্ত হয়েছে, অল্পতেই চোখে ভিজে ওঠে।

পেন্নাম হই। আপনে আমিন ডাক্তার না?

আমিন ডাক্তার অভিভূত হয়ে পড়ল। কানা নিবারণের সেই শক্ত সমর্থ শরীর আর নেই। মাথার মরকৃষ্ণ কালো চুল আজ কাশ ফুলের মত সাদা।

ডাক্তার সাব আমারে চিনছেন?

আপনেরে চিনতাম না? আপনেরে না চিনে কে?

ভগবান আপনের মঙ্গল করুক। আপনে কিন্তু ভুল কইলেন। আমারে এখন কেউ চিনে না। গান গাই না আইজ সাত বর। গলা নষ্ট, হাঁসের মত শব্দ হয়।

আমিন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

মতি মিয়া এখন খুব বড় গাতক। চিনছেন? সোহাগীর মতি মিয়া। নয়খান সোনার মেডেল আছে। রেডিওতে নিয়া গেছিল। মিনিস্টার সাব তার সাথে ছবি তুলছে।

আপনে এখন করেন কী?

কিছুই করি না ভাই। পুরান লোকদের সাথে দেখা হইলে তারা টেকাপয়সা দিয়া সাহায্য করে। খুব অচল হইলে মতি মিয়ার কাছে যাই। আমারে খুব খাতির। করে।

শইল কেমন আপনের?

বালা না। হাঁপানি হইছে। সারা জীবন শইলের উপরে অত্যাচার করছি। শইলের আর দোষ কি?

কানা নিবারণ হোগলাপোয় নেমে গেল। হাত ধরে নামিয়ে দিতে গেল আমিন ডাক্তার। টিকিট করা ছিল না। লঞ্চের একটা লোক কী একটা গাল দিয়ে কানা নিবারণের সার্ট

চেপে ধরতেই আমিন ডাক্তার উঁচু গলায় বলল, কার সাথে বেয়াদবি কর? জান এই লোক কে? গাতক কানা নিবারণ। ইনার মত বড়ো গাতক এই পিথিমীতে হয় নাই। কয় টেকা ভাড়া হইছে? আমার কাছ থাইক্যা নেও, আর ইনার পাও ধইরা মাফ চাও।

নিমতলি পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হেয় গেল। কত পরিচিত ঘরবাড়ি। ঐ তো দখিনমুখি বটগাছ। এর নিচেই হাট বসে প্রতি বুধবার। ঐ তো উত্তর বন্দ। এমন ঘন কালকা পানি অন্য কোনো হাওড়ে নেই। বড়ো মায়া লাগে।

নিমতলি থেকে একটা কোয়া নৌকা নিল আমিন ডাক্তার। সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় পৌঁছবে সোহাগী। শক্ত বাতাস দিচ্ছে, সন্ধ্যার আগেও পৌঁছতে পারে। নৌকার মাঝি নৌকা ছেড়েই জিজ্ঞেস করল, আপনে কেডা গো? চিনা-চিনা লাগে?

আমি আমিন।

আমারে চিনছেন?

না, তুমি কেডা?

আমি কালাচানের ছোড পুলা–বাদশা মিয়া। আপনের কাছে লেহাপড়া শিখছি।

পা ছুঁয়ে সালাম করল বাদশা মিয়া। অনেক খবর পাওয়া গেল তার কাছে। আজরফ একজন সম্পন্ন চাষী এখন। দুটি মেয়ে তার বড় মেয়ের নাম আতাবানু। ইস্কুলে যায়।

ইস্কুল হইছে নাকি?

হ চাচা, টিনের চালা।

আমিন ডাক্তার চমৎকৃত হয়।

চৌধুরীর খবর কি?

দুই চৌধুরীই মারা গেছে। পাঁচ-ছয় বচ্ছর হয়। বৌটা চৌধুরীবাড়িতেই আছে। মতি চাচার খবর কিছু হুনছেন?

কিছু কিছু হুনছি।

খুব বড় গাতক হইছে। প্রত্যেক বছর এক বার কইরা আসে এই দিকে। গানের রেকর্ড হইছে মতি চাচার, পাঁচ টেকা কইরা দাম।

চৌধুরীর অবস্থা কেমুন এখন?

খুব খারাপ। জ্ঞাতি মামলা-মোকদ্দমা কইরা সব শেষ কইরা দিছে। পুত্রসন্তান তো কেউ ছিল না চৌধুরীর।

আরেকটি আশ্চর্য হওয়ার মত খবর দিল বাদশা মিয়া। নিখল সাব ডাক্তার অনুফাকে নিয়ে বিলাত চলে গেছেন। যাবার আগে অনুফাকে নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন। এক রাত ছিলেন আজরফের বাড়ি।

মাইয়াটা কী যে সুন্দর হইছে চাচা, আর কী আদব-লেহাজ।

তার বাপের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?

নাহ্।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই মিনার দেওয়া সুন্দর মসজিদ চোখে পড়ল।

পাকা মসজিদ দিছে কে রে বাদশা?

সরকার সাবরা দিছে। মৌলভি আছে মসজিদের। জুম্মার দিন মানুষের জায়গা দেওন যায় না। সুখানপুকুর থাইক্যাও মাইনষে নামাজ পড়তে আইয়ে।

আমিন ডাক্তার মতি মিয়ার বাড়িতে না গিয়ে চৌধুরীবাড়ি উঠল। তাকে অবাক করে দিয়ে চৌধুরীবাড়ির বৌ তার পা ছুঁয়ে সালাম করল। আগের সেই কঠিন পর্দার এখন আর প্রয়োজন নেই।

ভালে আছ মা বেটি?

ভালো আছি ডাক্তার চাচা।

দীর্ঘ এগার বছর পর আবার চৌধুরীবাড়ি খেতে বসল আমিন ডাক্তার। কেউ তো তাকে সারা জীবনেও এত যত্ন করে খাওয়ায় নি। বারবার চোখ ভিজে ওঠে। পান হাতে নিয়ে বৌটি আগেকার মত মিঠি গলায় বলল, পেট ভরছে চাচা?

ভরছে মা। শুকুর আলহামদুল্লিাহ।

খাওয়াদাওয়ার শেষে বাইরের জ্যোতায় এসে বসে থাকে আমিন ডাক্তার। বৌটি এসে বসে দাওয়ায়, এক সময় মৃদু স্বরে বলে, আপনার কথা ঠিক হইছিল চাচা।

কোন কথা?

আপনে যে কইছিলেন, ওর মাথার দোষটা সারব। মরবার এক বচ্ছর আগে সত্যি সারছিল। খুব ভালো ছিল। আমারে নিয়া আষাঢ় মাসে আমার বাপের দেশে বেড়াইতে গেছিল।

বৌটি চোখ মুছে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল, আমারে নিয়া ময়মনসিংহ গেছিল। একটা হোটেলে আছিলাম। বাইস্কোপ দেখলাম ডাক্তার চাচা। আইজ আর চৌধুরীর উপরে আমার কোনো রাগ নাই।

বৌটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কত পরিবর্তনই না হয়েছে সোহাগীর। একটা দাতব্য ডাক্তারখানা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে এক দিন এক জন সরকারী ডাক্তার এসে বসেন। অল্প বয়েস। মেডিকেল কলেজ থেকে

পাশ করেই এসেছেন। খুব নাকি ভালো ডাক্তার। এক ফোঁটা দেমাগ নেই শরীরে। গত বৎসরের বাঘাই সিনির সময় ছেলেপুলেদের সঙ্গে মিলে খুব নাচানাচি করেছেন।

শরিফার চলচ্ছক্তি নেই। বিছানায় রাত-দিন শুয়ে থাকতে হয়। অসম্ভব। বুড়িয়ে গেছে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন।

আমিন ডাক্তার যখন বলল, দোস্তাইন, শরীলডা বালা? শরীফা শুন্যদৃষ্টিতে তাকাল।

আমি আমিন, আমিন ডাক্তার।

শরিফা চিনতে পারল না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাপা গলায় বলল, এরা আমারে ভাত দেয় না। আমারে না খাওয়াইয়া মারণের ইচ্ছা। আজরফ হারামজাদারে সালিসি ডাইক্যা জুতা পিটা করণ দরকার। আপনে আজরফ হারামজাদারে একটা ধমক দিয়া যান।

দোস্তাইন, আপনে আমারে চিনতে পারছেন না?

আজরফ হারামজাদা ইন্দুর মারা বিষ কিন্যা রাখছে। পানির সাথে মিশাইয়া খাওয়াইতে চায়।

আজরফ মনে হল আমিন ডাক্তারকে হঠাৎ উদয় হতে দেখে ঠিক সহজ হতে পারছে না। কোথায় উঠেছে, কোথায় খাচ্ছে, কিছুই জিজ্ঞেস করল না। নিজের বাড়িতে এসে উঠবার কথাও বলল না। থেমে থেমে বলল, সোহাগীতে থাকবেন। নি ডাক্তার চাচা?

আর যাইয়াম কই ক?

ডাক্তারী কইরা তো আর কামাইতে পারতেন না। সরকারী ডাক্তার আছে এখন। বালা ডাক্তার।

ওখন আর কাজ-কামের বয়স নাই আজরফ। শইলডা নষ্ট হইয়া গেছে।

নুরুদ্দিন লম্বা-চওড়া জোয়ান হয়েছে। বাপের মতো লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত এসেছে। আমিন ডাক্তার বলল, তুইও গান গাস নাকি নুরা?

জ্বী-না চাচা।

জংলা ভিটার ঘাটে যাস?

না চাচাজী, অখন আর যাই না।

আমারে লইয়া এক দিন জংলা ভিটার ঘাটে যাইস।

ক্যান চাচা?

দেখনের ইচ্ছা হইছে।

এই দীর্ঘ সময়েও জংলা ভিটার ঘাটের কোন পরিবর্তন হয় নি। জায়গাটির বয়স বাড়ে নি। আমিন ডাক্তার অবাক হয়ে দেখল, সেই ডেফল গাছটি এখনো আছে। নুরুদ্দিন লগি দিয়ে খুন্দা ঠেলছিল। সে হালকা গলায় বলল, জংলা ভিটায় মাইট আছে চাচা।

কে কইছে?

আমার মনে অয়।

খুন্দা এগুচ্ছে খুব ধীর গতিতে। ডেফল গাছের কাছের বাঁকটি পেরুতেই আমিন ডাক্তার বলল, এইখানে তুই একটা মেয়েমানুষ দেখছিলি। পানির মইধ্যে ভাসতে ছিল। হাতের মধ্যে লাল চুড়ি। তোর মনে আছে?

নুরুদ্দিন থেমে থেমে বলল, আছে চাচা। স্বপ্ন দেখছিলাম কিংবা চউখের ধান্ধা।

নুরুদ্দিনের অস্বস্তি লাগে। ফ্যাকাশেভাবে হাসে।

তুই ঠিকই দেখছিলি। স্বপ্ন-টপু না। আমি এই জিনিসটা নিয়া অনেক চিন্তা করছি। জেলখানাতে চিন্তার খুব সুবিধা আছিল রে নুরা।

নুরুদ্দিন চুপ করে রইল। আমিন ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগল। কাশি থামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, একটা কথা মন দিয়া শুন। মেয়েটার হাতভর্তি আছিল লাল চুড়ি। হাতভর্তি চুড়ি কোন সময় থাকে জানস নুরা?

নাহ্।

যখন নতুন চুড়ি কিনে। যত দিন যায়, তত চুড়ি ভাঙ্গে, আর কমে। কিছু বুঝতাছস?

নাহ্।

সোহাগীতে সেই বৎসর চুড়িওয়ালী আছিল শ্রাবণ মাসে। সব মেয়েরা চুড়ি কিনছে, তোর মাও কিছিল।

নূরুদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনে কইতেছেন মেয়ে সোহাগীর?

হ্যাঁ।

কিন্তু সোহাগীর কোনো মেয়ে তো মরে নাই চাচাজী।

মরে নাই কথাটা ঠিক না নুরা। বানের সময় সরকারবাড়ির একটা বউ নিখোঁজ হইছিল। কত খোঁজাখুঁজি করল, তোর মনে নাই?

আছে।

আমিন ডাক্তার চাপা স্বরে বলল, বানটা হইছিল কিন্তু জংলা ভিটার ঘটনার। তিন দিন পরে।

নুরুদ্দিন লগি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহু কাল আগে থইরকল গাছ থেকে অসংখ্য কাক কাকা-কে উড়ে গিয়েছিল। আজও হঠাৎ চারদিক থেকে কাক ডাকতে লাগল। নুরুদ্দিন হাত থেকে লগি ফেলে দিল। আমিন ডাক্তার শান্ত স্বরে বলল, ভয় পাইছস নুরা?

পাইছি।

ভয়ের কিছু নাই। চল ফিরত যাই।

ফিরবার পথে আমিন ডাক্তার একটি কথাও বলল না। দক্ষিণ কান্দায় নৌকা বেঁধে দুজনে উপরে উঠে এল। আমিন ডাক্তার মৃদু স্বরে বলল, একটা খুব বড় অন্যায় হইছে সরকারবাড়িত। একটা মেয়েরে খুন কইরা ফালাইয়া রাখছিল জংলা ভিটাত। বুঝতামস তুই নুরা?

চাচা বুঝতাছি।

আমি ওখন কি করবাম জানস?

নাহ।

সরকারবাড়ির সামনের ক্ষেতটাত গিয়া বসবাম। বলবাম, আপনেরা একটা বড়ো অন্যায় করছেন। তার বিচার চাই।

আমিন ডাক্তার হেসে উঠল।

এক অপরাহ্নে আমিন ডাক্তার তার ধূলিধূসরিত লাল কোট গায়ে দিয়ে সরকারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটি ছোটখাট, কিন্তু পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে বলেই হয়ত সরকারবাড়ির সামনের প্রাচীন জামগাছ থেকে অসংখ্য কাক কাকা করে ডাকতে লাগল।

———

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ

মাইট – স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসি। সাধারণত মাটির নিচে পোঁতা থাকে এবং আলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন (?) হয়ে থাকে। এরা নিজেরাই চলাচল করতে পারে।

খুন্দা – ঘাস-কাটা হোট নৌকা।

দোস্তাইন – বন্ধুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে ব্যবহৃত সম্মানসূচক সম্বোধন।

বাঘাই সিন্নি – নবান্ন জাতীয় উৎসব।

বারাবান্দানী – যারা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

লারবড়শি – বোয়াল মাছ মারবার জন্যে ব্যবহৃত বড়শি। জ্যান্ত ব্যাঙ বা টাকি মাছের টোপ দিয়ে এই সব বড়শি সারা রাত পেতে রাখা হয়।

মা-খলা – মাছ শুকানর জন্যে ব্যবহৃত উঁচু জায়গা।

ফিরাইল – শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে এক শ্রেণীর বিশেষ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন (?) ফকির।

জিরাতী – ভিনদেশী চাষী, যারা চাষ শেষ হলে ধান নিয়ে নিজ দেশে চলে যায়।

কান্দা – বাঁধ জাতীয় উঁচু জায়গা (প্রাকৃতিক)।

বন্দ – ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ। ভাটি অঞ্চলের বনগুলি বর্ষায় হাওড়ে পরিণত হয়।

পাইল করা – মাছ মারা বন্ধ রাখা। সাধারণত জলমহালগুলি দু-তিন বৎসর পাইল করার পর মাছ মারা হয়।

কেরায়া নৌকা – ভাড়া করা নৌকা।

জার – জাড়, অর্থাৎ শীত।

শরকি – বল্লম।

জালা – বীজতলার ধান।